নৃবিজ্ঞান
পত্রিকা

সংখ্যা ২৯ ২০২৪

নৃবিজ্ঞান বিভাগ ● জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ● ঢাকা

নৃবিজ্ঞান
পত্রিকা

সংখ্যা-২৯ ২০২৪

নৃবিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

Nrvijnana Patrika

Journal of Anthropology

Volume-29 **2024**

Department of Anthropology
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka

সম্পাদনা পরিষদ

সদস্য আকবার হোসেন

রঞ্জন সাহা পার্থ

মোহাম্মদ মাসুদ রানা

রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা

সম্পাদক মাহমুদুল হাসান সুমন

Editorial Board

Members Akbar Hussain

Ranjan Saha Partha

Mohammad Masud Rana

Rezwana Karim Snigdha

Editor Mahmudul Hasan Sumon

নৃবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনা আহবান করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন।

যোগাযোগ সম্পাদক নৃবিজ্ঞান পত্রিকা
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।
ইমেইল: anthro@juniv.edu

Article and book reviews relating to various areas of anthropology are invited. Please see overleaf for more information.

Correspondence Editor, Nrvijnana Partika
Department of Anthropology
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka-1342 Bangladesh.

Tel: (880-2) 1045-51, ext: 1447
E-mail: anthro@juniv.edu,
anthju@hotmail.com

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
© 2024 Department of Anthropology, Jahangirnagar University.

Authors are responsible for the opinions and statements published in the respective papers.

মূল্যঃ ৳ ১০০ টাকা মাত্র। শিক্ষার্থীদের জন্য ৳ ৭০ টাকা (বাংলাদেশ)।
Price: Tk. 100; For students Tk. 70 (Bangladesh). US$ 5 (Overseas).

Printed by: Naksha Impressions Limited
27, Nilkhat, Babupura, Dhaka-1205

নৃবিজ্ঞান পত্রিকার জন্য লেখা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য লেখকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখাটি মৌলিক এবং অপ্রকাশিত হতে হবে। অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা প্রকাশিতব্য হিসেবে গণ্য হবেনা এবং আমরা তা প্রকাশের জন্য বিবেচনা করবো না। মৌলিকত্ব বলতে আমরা বুঝছি যে কোনো গবেষণাশ্রিত, গবেষণাধর্মী, অন্তদৃষ্টিমূলক, বিশ্লেষণাত্মক বা তর্কশাস্ত্রীয় রচনা।

লেখা বাংলা অথবা ইংরেজি, যে কোন ভাষায় হতে পারে। লেখার সাথে একটি সারসংক্ষেপ (বাংলা লেখার বেলায় ইংরেজিতে) কাম্য।

লেখার দুইটি কপি জমা দিতে হবে। হাতে লেখা পান্ডুলিপি অগ্রহণযোগ্য। লেখার দু'টি মুদ্রিত কপি এবং একটি ইলেক্ট্রনিক কপি (সিডি/ ইমেইল সংযুক্তি) জমা দিতে হবে।

লেখাটি ৫০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া কাম্য। মুদ্রিত কপির বেলায় A4 বা লেটার মাপের কাগজের ডাবল স্পেসে টাইপ থাকতে হবে।

পাদ টীকা ও তথ্যসূত্রঃ প্রবন্ধের শেষে ক্রমানুসারে থাকবে। মূল টেক্সটে ও টীকার কোনো গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ থাকলে বন্ধনীর ভেতরে লেখকের নাম (last name) ও প্রকাশকাল উল্লেখ করতে হবে (উদাহরণ- ছফা ২০০১; ত্রিপুরা ২০০০; Hastrup 1995 and Whitchead 1984) প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে (যেমন উদ্বৃতির বেলায়) বই/জার্নালের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে (উদাহরণ- ছফা ২০০১: ১৬; Abu-Lughod 1991:137)। মূল টেক্সটে ও টীকার উল্লেখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে র একটি পূর্ণ তালিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যসহ লেখকদের নামের শেষাংশ (last name) আদ্যাক্ষরের অনুক্রমে প্রদান করতে হবে। নিচের উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

Whole book:

Ward, R (1996). *Changes in Biochemistry*. London: University College London Press.

Chapter in a book:

Crane, A (1991). How biochemistry changes. In: Hudson, W. and French C. eds. *Living Biochemistry*. Massachusetts: MIT Press, pp. 80-83.

Journal article:

Kaplan, J. (2008). Historical changes. *Educational Psychologist*. 42(6), pp. 536-9.

Journal article (Online):

Sutton-Smith B. and Rosenberg, R.G. (1961). Sixty years of historical change in the game preferences of American children.
Journal of American Folklore [Online], 74(291), 17-46. Available from: www.jstor.org [Accessed 2 December 2007].

Government publications:

Department of Education. *Annual Report 2000. HMSO, London*.

Website:

National Health Service (2009). Swine flu [Online]. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Pandemic-flu/Pages/Symptoms.aspx [Accessed 8 October 2009]

লেখার মান সম্পর্কে সম্পাদনা পরিষদের মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অপরাপর জার্নালের মতো সম্পাদনা পরিষদ পর্যালোচকদের মতামত গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে সম্পাদকের পক্ষ থেকে লেখকের সাথে যোগাযোগ করা হবে।

প্রকাশিত লেখার জন্য লেখক(গণ) নৃবিজ্ঞান পত্রিকার দু'টি সৌজন্য সংখ্যাসহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত হারে সম্মানী পাবেন, যেটি খুব নগণ্য বটে।

প্রকাশিত লেখার গ্রন্থ স্বত্ব নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর হবে। তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত রচনা কোনো সংকলিত/সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশের জন্য নৃবিজ্ঞান বিভাগে একটি সৌজন্য পত্র দিয়েই প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করা যাবে।

সম্পাদকীয়

নৃবিজ্ঞান পত্রিকার এই সংখ্যাও দেরিতে প্রকাশিত হলো। এর কারণ অনেক। সে বিষয়ে না যেয়েও বলা যায় দেরি হলেও আমরা যে প্রত্রিকাটি এখনও বের করতে পারছি সে জন্য খুশি, বিশেষ করে নিওলিবারেল একাডেমিক যে দৌড়ঝাঁপ, তাতে এই পত্রিকায় লিখবার সময় কোথায়! বিদ্যাজাগতিক আলোচনায় নানা ধরনের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ইত্যাদি মানদণ্ডের আগমনের কারণে অনেকে আজকাল এরকম পত্রিকায় লিখে কী হবে এমন মতামত দেন। সেই সব প্রবল মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই পত্রিকা!

এবারের সংখ্যায় মোট পাঁচটি প্রবন্ধ ও একটি গ্রন্থ পর্যালোচনা ছাপা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে দৃশ্যগত নৃবিজ্ঞানের লেন্স থেকে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' ছবির পর্যলোচনা। হাওর পাড়ের মানুষের বিস্তারিত জীবনালেখ্য এই ছবির মূল উপজীব্য বিষয়। জান্নাতুল ফেরদৌস, মো: হাফিজুল ইসলাম ও শাওলী মাহবুব এর রচনায় চলচ্চিত্রটি এথনোগ্রাফিক ফিল্ম হয়ে উঠেছে কিনা তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং এটা করতে যেয়ে হাজির করেছেন ভিজুয়াল নৃবিজ্ঞানের নানা তর্ককে। লেখকরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে দৃশ্যগত নৃবিজ্ঞানের প্রথাগত পরিসর আরো বৃদ্ধি পাবেই বলে আমাদের ধারণা। রঞ্জন সাহা পার্থ ইকো ট্যুরিজম ডিসকোর্স ও চর্চা নিয়ে লিখেছেন। এটি লেখকের দীর্ঘদিনের গবেষণা পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে তৈরি হওয়া একটি রচনা। এই প্রবন্ধে ইকো ট্যুরিজমের ধারণা কীভাবে 'ট্যুরিজম ব্যবসার' সাথে জড়িতরা ভিন্নখাতে ব্যবহার করছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ট্যুরিজম কীভাবে সংস্কৃতির পণ্যকরণ করছে সেদিকে আলোকপাত করেছেন মো: রহমত উল্লাহ ও মালিহা তাসনিম। কেইস হিসাবে তারা বেছে নিয়েছেন ট্যুরিজম জগতের সাম্প্রতিক বছরের সেনসেশান সাজেককে। এই প্রবন্ধ পর্যটন সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ঈশিতা দস্তিদার ও আকবার হোসেন হালের মোবিলিটি লিটারেচার ঘেঁটে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে এই সাহিত্য বাংলাদেশের খাসি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। খাসি জনগোষ্ঠীকে একটা আবদ্ধ অর্থনীতিতে দেখবার চোখটা একটু নড়বড়ে করে তোলাটাই একটা উদ্দেশ্য প্রবন্ধটির। এম ভি আনোয়ার আহমেদ ও এ কে এম জাকারিয়া আমাদের সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাজাগতিক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন: নিও লিবরেল পলিসি কীভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বস্তুকে নির্মাণ করছে, কীভাবে গঠন করছে গবেষণার ল্যান্ডস্কেপ। এই সংখ্যার শেষ লেখা একটি গ্রন্থ পর্যালোচনা। গ্রন্থটি মাসউদ ইমরানের Safeguarding-Governmentality of the Cultural Heritage: Democratising, Conserving and Representing the Past(s) of Global South । পর্যালোচনা করেছেন মোহাম্মদ মনোয়ার হুসেন।

এই সংখ্যার বিভিন্ন প্রবন্ধের রিভিউয়ার হিসাবে ছিলেন আইনুন নাহার, মানস চৌধুরী, সাঈদ ফেরদৌস, মো. ছিদ্দিকুর রহমান, মো. মাসউদ ইমরান, শায়লা শারমিন, বখতিয়ার আহমেদ, বুলবুল সিদ্দিকী। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবার জন্য আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রবন্ধকারদের প্রতি, তারা যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, আমাদের সহযোগিতা করেছেন। নৃবিজ্ঞান পত্রিকা প্রায় তিন দশক ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। আমরা আশাবাদী পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে এবং আরো সমৃদ্ধ সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব হবে আগামীতে।

মাহমুদুল হাসান সুমন
সম্পাদক, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা ২৯
জুন ২০২৪

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা

'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' কি এথনোগ্রাফিক ফিল্ম? নৃবৈজ্ঞানিক লেন্সে দেখা ১
জান্নাতুল ফেরদৌস
মো: হাফিজুল ইসলাম
শাওলী মাহবুব

ইকো-ট্যুরিজমঃ ডিসকোর্স ও চর্চা ১৯
রঞ্জন সাহা পাথ

Culture to Commodity: Exploring the Intersection of Tourism, Consumerism of Culture and Media in the Sajek Valley ৩৯
Md. Rahmat Ullah
Maliha Tasnim

Sense of Belonging amongst the Khasis in Bangladesh: Some Theoretical Considerations on Mobility ৫৯
Eshita Dastider
Akbar Hussain

The Changing Landscape of Social Science Research at SUST in the Wake of Neoliberal Policy: Insights from Researchers ৭৫
SV Anwar Ahmed
AFM Zakaria

Safeguarding-Governmentality of the Cultural Heritage: Democratising, Conserving and Representing the Past(s) of Global South. Md. Masood Imran. Dhaka, Bangladesh: The University Press Limited, 2024 ৯৫
Muhammad Manowar Hossain

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ কি এথনোগ্রাফিক ফিল্ম? নৃবৈজ্ঞানিক লেন্সে দেখা

জান্নাতুল ফেরদৌস[১]
মোঃ হাফিজুল ইসলাম[২]
শাওলী মাহবুব[৩]

সারসংক্ষেপঃ
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অঞ্চল একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রকে ধারণ করে আছে দীর্ঘকাল। এখানে বসবাসরত মানুষেরাও প্রকৃতির সেই বিশেষ ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে থেকেছে। ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ চলচ্চিত্রটি ভাটির দেশ আর মাটির গল্প। সেই মাটির গল্পে আছে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে দীর্ঘকাল টিকে থাকা অদম্য জনমানুষের কাহিনী। বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়ন, অতিবৃষ্টি আর জলবায়ু পরিবর্তনের ধারায় প্রান্তিক দেশের, প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রের বিষয়াবলী। রুদ্র প্রকৃতির বিপরীতে এখানে মানুষ হয়ে উঠেছে মূল প্রতিপাদ্য। এই সংগ্রামকে চিত্রায়িত করেছেন মুহাম্মদ কাইউম। হাওরের মানুষের জীবন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের নিয়ত সংগ্রামটিকে প্রতিফলিত করার জন্য পরিচালক চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ সিনেমার রচনা, পরিচালনা প্রযোজনাও করেছেন মুহাম্মদ কাইউম। এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো চলচ্চিত্রটি একটি এথনোগ্রাফিক ফিল্ম কি না তা নির্ণয় করা। চলচ্চিত্রটি যেহেতু হাওরপাড়ের মানুষের বিস্তারিত জীবনালেখ্য, ফলে সেখানকার মানুষের জীবনাচরণ চিত্রায়নের মাধ্যমে এথনোগ্রাফিক ফিল্ম রচনা করা সম্ভবপর হয়েছে বলে প্রবন্ধটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। সর্বোপরি, চলচ্চিত্রটি এথনোগ্রাফিক ফিল্ম হয়ে উঠেছে কি না তা বিশ্লেষণের জন্য নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসহ অন্যান্য তত্ত্ব এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া ও প্রান্তজনের বিদীর্ণ হবার চিত্রণ

বাংলাদেশের উত্তরের হাওর অঞ্চল একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রকে ধারণ করে আছে দীর্ঘকাল। এখানে বসবাসরত মানুষেরাও প্রকৃতির সেই বিশেষ ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে থেকেছে। ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ ভাটির দেশ আর মাটির গল্প। সেই মাটির গল্পে আছে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে দীর্ঘকাল টিকে থাকা অদম্য জনমানুষের কাহিনী। বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়ন, অতিবৃষ্টি আর জলবায়ু পরিবর্তনের ধারায় প্রান্তিক দেশের, প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রের বিষয়াবলী। রুদ্র প্রকৃতির বিপরীতে এখানে মানুষ হয়ে উঠেছে মূল প্রতিপাদ্য। এই সাংগ্রামকে চিত্রায়িত করেছেন মুহাম্মদ কাইউম। হাওরের মানুষের জীবন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের নিয়ত সংগ্রামটিকে প্রতিফলিত করার জন্য পরিচালক চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। মুহাম্মদ কাইউম একই সাথে ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ চলচ্চিত্রটি রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন। পরিচালকের বিশেষ সহকারি ছিলেন প্রয়াত গাজী মাহতাব হাসান, চিত্রগ্রাহক হলেন মাজহারুল রাজু, সুরকার সুকান্ত মজুমদার ও সাত্যকি

[১] মুক্ত গবেষক। Email: jferdoush091@gmail.com
[২] মুক্ত গবেষক। Email: mdhafijul408@gmail.com
[৩] অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। Email: shaolee@anp.jnu.ac.bd

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিনেমাটি সম্পাদনা করেছেন অর্ঘ্যকমল মিত্র। সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়িতা মহলানবিশ, উজ্জ্বল কবির হিমু, সুমি ইসলাম, সামিয়া আকতার বৃষ্টি, বাদল শহীদ, মাহমুদ আলম এবং আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছে ৪ নভেম্বর ২০২২, যার স্থিতিকাল ১১৭ মিনিট। এই চলচ্চিত্রটি পরিচালকের একটি স্বাপ্নিক পরিবেশনা। কেননা চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য পরিচালক বহুজাতিক কোম্পানি বা ব্যাংক থেকে কোনপ্রকার আর্থিক সাহায্য বা সরকারের কাছ থেকে কোন অনুদান নেননি। সৈকত দে লেখেন (২০২২) এ এক স্বাধীন নির্মাতার নির্মাণ। কারো অযাচিত জোর জবরদস্তি ছাড়াই পরিচালক এটি নির্মাণ করেছেন। পরিচালক মুহাম্মদ কাইউমের প্রায় দুই যুগের স্বপ্ন আর পাঁচ বছরের প্রচেষ্টা "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" চলচ্চিত্রটি। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে নির্মিত হওয়া এই চলচ্চিত্রে সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। জলবায়ু অভিবাসন, কৃষকের সংগ্রাম ও দরিদ্রতা, প্রশাসনের দৌরাত্ম সবটাই মানব জীবনের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে এখানে।

বর্তমান প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য হলো এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র হিসেবে "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা নির্ণয় করা। এছাড়াও চলচ্চিত্রটি কোন ঘরানার? এটা কি রিয়ালিস্ট চলচ্চিত্র, না এক্সপ্রেসনিস্ট চলচ্চিত্র অথবা চলচ্চিত্র এবং দর্শকের সম্পর্ক বোঝার তৃতীয় তত্ত্বীয় সূত্রে নিহিত? অথবা এটি শুধুই একটি এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র? চলচ্চিত্রটির এথনোগ্রাফিক মূল্যই বা কতখানি? এইসব গবেষণা প্রশ্ন দিয়েই আবর্তিত হয়েছে প্রবন্ধটি।

"কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া": থিম এবং হাওর অঞ্চলের বাস্তবতা প্রসঙ্গে

চলচ্চিত্রের প্রচার, প্রসার এবং থিম প্রকাশে পোস্টার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোস্টারের টেক্সট এবং ইমেজ বিশ্লেষণের জন্য সেমিওলজি বা সংকেতবিদ্যার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। পোস্টারে ব্যবহৃত ইমেজ বা প্রতিচ্ছবি, রঙ, শব্দ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ জরুরী। রোঁল্যা বার্থের ভাষায় বলা যায়, পোস্টারের ভাষাগত প্রতিচ্ছবি এবং connoted image বিশ্লেষণ সম্ভব (Barthes, 1964)। পোস্টারের গায়ে সাঁটানো "ভাটির দেশের মাটির ছবি" শব্দগুলো নির্দেশ করে দেয় যে, এটি সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর অঞ্চলের কাহিনী। ভাটির এই অঞ্চলটি ওপারের পাহাড় থেকে আসা ঢলের পানিতে নিমজ্জিত হয় প্রতিবছর। পোস্টারে দেখা যায়, হাওরের মাঝে জেগে ওঠা চর, অনাবৃত শরীরে পরা লুঙ্গি ও কোমরে গামছা বাঁধা অবস্থায় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মানুষটিই সিনেমার প্রধান চরিত্র "সুলতান"। জ্যঁ পল সার্ত্রে Nothingness এর কথা উল্লেখ করেছেন। অস্তিত্ববাদে অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যার উপস্থিতি থাকে সেই অস্তিত্বকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় (Smith, Flowers, and Larkin 2009, p. 19)। চারপাশে পানি, ঘিরে থাকা কিছু কাক আর নি:সীম শূন্যতা এবং রিক্ততার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুলতান যেন নিজের শূন্য অস্তিত্বের দিকেই তাকিয়ে আছে। সাহিত্যে প্রায়শই কাক অশুভ আর অকল্যাণের প্রতীক। পোস্টারটির ভাষা, যেমন স্পষ্টভাবে একটি বিশেষ অঞ্চলকে নির্দেশ করে তেমনি এর সাংস্কৃতিক অর্থ চিহ্নিত করে চলচ্চিত্রটি বুঝতে সহায়তা করে।

আসা যাক, চলচ্চিত্রটির নামকরণ প্রসঙ্গে। নামকরণে আশ্রয় নেয়া হয়েছে রূপকের। এই চলচ্চিত্রের অন্যতম চরিত্র শিশুশিল্পী রোকাইয়া ওরফে "রুকু" 'কুড়া পক্ষী'র সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় তার বন্ধুদের। হাওরের শিশু-কিশোরদের অন্যতম আনন্দ কুড়া পক্ষীর বাসা (ডাহুক পাখি) দেখা। কুড়া পাখি, ডাহুক পাখি বলেও পরিচিত। রুকুর ভাষ্যে, কুড়া পাখি পোষও মানে। চলচ্চিত্রের এক অংশে হাওরে কুড়া পাখীর বিচরণকাল আর দূর পাহাড়ে চলে যাবার বর্ণনা দেয় সে। রুকু তার বন্ধুদের বলে, 'নতুন পানি হাওরে এলে, পানি যখন কমে যায় তারা ভিড় করে ছোট মাছ খায়, ধানক্ষেতে পোক (পোকা) খায়, ঝোপঝাড়ে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়, পাহাড়ি ঢলের পানি এলে কুড়া পক্ষী উড়ে চলে যায়।' হাওরের পানি কমলে কুড়াপক্ষী

যেমন খাবারের খোঁজে মাছ খেতে আসে, আবার পাহাড়ি ঢালের পানিতে হাওর পুরো ডুবে গেলে খাবার না পেয়ে অন্যত্র চলে যায়, তেমনি হাওরপাড়ের মানুষরাও কুড়াপক্ষীর মতো জীবিকার তাগিদে, হাওরের বসতবাড়ি ছেড়ে কখনও ভোলাগঞ্জ পাথর ভাঙার কাজে অথবা শহরে জীবিকার সন্ধানে পরিবার নিয়ে চলে যায়। খাবারের খোঁজে "কুড়াপক্ষী"র মতো হাওরের মানুষকেও অজানা শূন্যে পাড়ি জমাতে হয়। কুড়া পক্ষীর জীবনচক্রের সাথে হাওরের মানুষদের অভিবাসনের চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রটির নামকরণে এই রূপক ব্যবহার তাই যথার্থ।

হাওরে যখন ফসল ওঠে তখন দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিক আসে ধান কাটার জন্য। সিনেমার শুরুতেই দেখা যায়, নেত্রকোনা থেকে সৎ মায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, ব্যাপারীসহ বত্রিশজনের একদল শ্রমিকের সাথে হাওর অঞ্চলে আসে মাতৃহীন সুলতান। যাবার সময় কণ্ঠে তার আক্ষেপ "আমার লাগি তোমরার এতো কষ্ট হয়, তোমরারে আর জ্বালাইতাম না"। বছর চুক্তিতে তার বান্ধা কাজ (দিনরাত ২৪ ঘন্টা বাড়িতে অবস্থান করে একবছর কাজ করা) ঠিক হয় হাওরের এক বাড়িতে। শুকনো হাওর পেরোতে পেরোতে ব্যাপারী সুলতানকে হাওর অঞ্চলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে বর্ষায় সাগরের সমান পানি থাকে হাওরে, এজন্য তার আরেক নাম কালীদহ। বড় বড় ঢেউ থাকে তখন। হাওর সম্পর্কে বলা হয় "বর্ষায় নাও, হেমন্তে বাও।" বছরে ছয়-সাত মাস পানির নীচে থাকার পর জমি ভেসে উঠে, তখন একটাই ফসল আবাদ করা হয়, তা হলো ধান। এক ফসল "সেই ধানই হলো হাওরের মানুষের জান"। হাওরের এ মাথা থেকে সে মাথা এতো বেশি ধানের আবাদ হয় যে, হাওরের মানুষের পক্ষে সেগুলো কাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে ব্যাপারীর ভাষ্যে, তাদের মতো অভাবী বুভুক্ষু মানুষেরা হাওরে আসে কাজের খোঁজে। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, ফরিদপুর থেকে হাওর অঞ্চলে আসে ধান কাটার জন্য। এতো ধান ফলনের খবর জেনে সুলতানের মুখেও হাসির ছটা দেখা যায়।

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে মরে যাওয়া ছেলের বউ আর দু'বাচ্চা নিয়ে এক জীবনঅভিজ্ঞ বৃদ্ধের সংসারে সুলতানের কাজ জোটে। মাছ ধরতে গিয়ে মরে যাওয়া পুরুষটি ছিলো পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম পুরুষ। ফলে বাড়ির গৃহস্থালী কাজের জন্য সেখানে একজন পুরুষের অভাব ছিলো। ব্যাপারী সুলতানকে পরিচয় করিয়ে দেয় পরিবারটির সাথে। সুলতান এবং ব্যাপারী মাটিতে বসে পরিবারের বৃদ্ধ অভিভাবকের সাথে কথা বলতে শুরু করে। সুলতান জানায়, তার বাড়ি নেত্রোকোণা জেলায়; দূর্গাপুর থানার বিলাসপুরে। এদৃশ্যে অভাবের মাঝেও দেখা যায় আতিথেয়তার আন্তরিকতা। যাবার সাথে সাথেই বৃদ্ধ তাদের পানি দিয়ে আপ্যায়িত করতে চান। ব্যাপারীকেও খেয়ে যেতে বলেন। হাওরে বসবাসরত পরিবারটির ভেতরে ও বাইরে প্রবল ক্ষত। আয় রোজগারবিহীন সংসারটিতে দারিদ্রের কষাঘাত, টিনের ঘর অথবা মাটির ঘরগুলো হাওরের উঁচু ভিটিতে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। রান্নাঘরের সামনে রাখা পাটকাঠির (শোলা) উপর গোবর লাগিয়ে জ্বালানি তৈরি করা হয়েছে, যা রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপারীও সুলতানের অসহায়ত্বের কথা জানায় বৃদ্ধকে। প্রধান নারী চরিত্র রুকুর মা পেটে-ভাতে চুক্তিতে থাকতে বলে সুলতানকে। আয় রোজগার হলে পরবর্তীতে টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আর দু'বেলার বেশি খাওয়া পাওয়া যাবে না তাও জানিয়ে দেয়া হয়। রুকুর মা কথাগুলো সুলতানকে সরাসরি না বলে প্রতিবেশি চাচীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহিণীরা এখনও আগুন্তকের সাথে সরাসরি কথা বলেন না, সেই গতানুগতিক চিত্রই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সুলতান রাজি হয় এসব শর্তে। হাল বাওয়া, গরু চড়ানো, মাটি কাটা, মাছ ধরা সবকিছু করতেই সে রাজি হয়। অপরিচিত পরিসরে শুরু হয় সুলতানের নতুন জীবন। রুকু প্রতিবেশী এবং হাওরের প্রতিবেশ দুটোর সাথেই পরিচয় করিয়ে দেয় সুলতানকে।

পরের দৃশ্যে দেখা যায়, পাশপাশি বাড়ির ঘিঞ্জি পরিবেশে এক এনজিও কর্মী কিস্তির টাকা তুলছেন। সুফিয়া

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নামের একজনকে খুঁজছেন তিনি। জানা যায়, সুফিয়া পাড়ি জমিয়েছেন ভোলাগঞ্জ। রোজগার নেই, তাই পাথর ভাঙার কাজে গেছেন টাকা আয় করতে। ধান কাটা শুরু হলে হাওরে ফিরে আসবেন, এসে কিস্তি শোধ করবেন। এসময় এনজিও কর্মী জানায়, একসপ্তাহ পর কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। মূলত এনজিও থেকে টাকা ঋণ নিয়ে দরিদ্র কৃষকরা জমি বর্গা নেয় এবং ধান চাষ করে হাওরে। সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয় প্রতি সপ্তাহে। পরিশোধ না করতে পারলে দরিদ্রদের পুলিশ ধরে নিয়ে যায় অথবা তাদের বাড়ির হাঁস-মুরগি নিয়ে যায় এনজিও কর্মীরা। এনজিও প্রসঙ্গে রুকুর কাছে সুলতান জানতে চাইলে রুকু জানায়, নতুন ধান ওঠার আগে চৈত্র মাসে হাওরে নিদান কাল থাকে। কারো ঘরেই ধান থাকে না তখন। নিজেদের পেট তখন নিজেদের চালাতে হয়। পাশাপাশি সপ্তাহে সপ্তাহে ঋণ পরিশোধ করা প্রান্তিক কৃষকদেরকে আরও সর্বস্বান্ত করে দেয়। এসময় সুলতান জমি ভরা ধান দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। সেটা দেখে রুকু বলে, বৈশাখের পর থেকে সেখানে শুধু পানি আর পানি থাকবে।

সারাদিন পর রাতের বেলা রুকুদের পরিবারের সাথে খেতে বসে সুলতান। রুকুর মা জানায়, তারা দু'বেলা রান্না করে, ভোরে আর সন্ধ্যাবেলা (হাইঞ্জাবেলা)। ভোরের ভাত কিছু বেঁচে থাকলে দুপুরে খাওয়া পাবে। নইলে সেই সন্ধ্যাবেলা খাওয়া। ঠিক এসময়ে রুকুর মায়ের ঘোমটা আর দেখা যায় না। সুলতান জানায় এই ভাতের জন্য সৎ মায়ের হাতে অনেক মার খেয়েছেন তিনি। সে কথা মনে করে তার কান্না পায়। মা মরে যাবার পর এতো সমাদর করে তাকে কেউ কখনও খেতে দেয়নি। এ কথা শুনে রুকু নিজের অল্প ভাত থেকেও সুলতানের পাতে ভাত তুলে দেয়। বলা বাহুল্য, এতো আন্তরিকতা মাতৃহারা সুলতানকে মায়ায় বেঁধে ফেলে। সকালে তারা খায় ছোট মাছ, গিমাই শাক আর বিকেলে টক ডাল, শুকনা মরিচ, লবন তরকারি ইত্যাদি। যাই থাকুক হাওরের মানুষ চায় পেট ভরে ভাত খেতে। রুকুর মতে, "আমগো হাওরের মানুষের একটাই স্বপ্ন, প্যাটটা ভইরা ভাত খাওয়া"। এ হলো তাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন।

উজান থেকে ঢল নামার আগেই ধান কাটা, বাছা, নেয়ার দৃশ্যগুলো চমৎকার। খুব লক্ষ করলে ধান কাটার কাঁচি, ধান নেবার জন্য চাকাওয়ালা গাড়ি, অথবা নৌকা ভরে ধান নেয়া আলাদা করে নজর কাড়ে। ধান ছাড়া আর কোন শস্য হয় কিনা সুলতানের জিজ্ঞাসায় রুকুর মা জবাব দেয়, ধানই সারা বছরের আশা-ভরসা। খাওয়া, পরনের কাপড়, ঘর-বাড়ি তৈরি, বিয়ে, চিকিৎসার খরচ সবকিছুতেই ধানের উপর নির্ভর করে হাওরের মানুষেরা। কাজেই যার ধান আছে, তার সব আছে। যার ধান নেই, তার কিছুই নেই। রুকুর মা চার হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দুই ক্ষেত ধান বোনে, যেটা আর দুইরোদ পেলেই শুকিয়ে যেতো। কিন্তু এরই মধ্যে পাহাড়ের উজান থেকে পানি চলে আসে। যদিও খুব বেশি ক্ষতি হয় না। ধান অনেকটাই ঘরে নিতে পেরেছিল তারা। ঢলের পানি আসা শুরু হয়। অবাক চোখে তাকিয়ে পানি দেখে সুলতান। চলচ্চিত্রের এই অংশে পানিই হয়ে ওঠে মুখ্যচরিত্র বা প্রোটাগনিস্ট। একরাতে পানি এসে ডুবে যায় এলাকা। পানি-বেষ্টিত হাওর অঞ্চলে তখন অন্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। কলকল করে সবসময় নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে হাওরের পানি। নৌকার গায়ে, দাঁড় টানার সময়, ঘরের কাছে অথবা ভাসতে থাকা হাঁসের গায়ে, সবখানে পানির সদর্প ছুটে চলা। হাওরে পানি এলে ছোট ছেলেমেয়েরাও আনন্দিত হয়। পানিতে সাঁতরে উৎসবে মাতে শিশু-কিশোররা। আকাশ ভরা ঘন কালো মেঘ আর হাওরের পানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ক্যামেরায় দীর্ঘক্ষণ দেখা যায় পানির এই রুদ্র তাণ্ডব। চলচ্চিত্রটির এই অংশ থেকে বর্ষাকালের হাওরের পরিবেশ ও বসবাসরত মানুষের অসহায়ত্ব সহজেই বুঝে নেয়া যায়।

হাওরের নতুন পানিতে যে আনন্দ, সেই পানিরই আবার ভয়ানক রূপ দেখা যায়। হাওরের পানিতে ডুবে গিয়ে রুকুর বাবা, রুকুর ছোট বোন আবুর মৃত্যু হয়। তাদের বাড়িঘরও ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয় ধেয়ে

আসা পানিতে। সেইসাথে হাওরের মানুষের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফসল ধান পেকে ওঠার আগেই হাওরের পানি সব নিয়ে যায়। এমনকি মানুষ মারা গেলে যে কবর দেবে তারও উপায় থাকে না। তীব্র জলস্রোত কবর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কবরস্থ না হওয়ার আশংকা নিয়ে রুকুর বৃদ্ধ দাদার অভিজ্ঞতা, "হাওরে পানি আইলে কূল কিনারা পাইতা না, মানুষ মরলে মাটি যে দিবো সেই জমিনও নাই। কবর দিতে না পারায় কতো লাশ ভেলায় ভাসায় দিছে।" রুকুর দাদা মানুষের বসতিকেই দায়ী করেন এই বিপুল পানি নেমে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হবার জন্য। এই পানির সাথে সংগ্রাম করেই হাওরের মানুষকে টিকে থাকতে হয় প্রতিনিয়ত। রাতে ঘুমোতেও হয় ভিটেমাটি ভেঙে যাবার ভয় নিয়ে। একদিন তাই এলাকার পাড় ঠিক করতে, এলাকার মানুষদের মতো সুলতান নিজেও হাওরের পানি ঠেলে বাঁশ কিনতে যায় পাহাড়ের ঢালের বাজারে। বাজার থেকে বাঁশ এনে পানিতে নেমে সবার সাথে শক্ত করে ভিটে-বাড়ির পাড় বাঁধায়। এসময় তাকে আর হাওর অঞ্চলের বাইরের কেউ বলে মনে হয় না। ধীরে ধীরে হাওরেরই একজন হয়ে ওঠে সুলতান। সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ ঘটে সুলতানের।

নিজের জমিতে আসা পানির মাছ ধরতে পারে না হাওরের অঞ্চলের বাসিন্দারা। মাছ যেনো ধরতে না পারে এজন্য ইজারাদার বন্দুক নিয়ে পাহারা বসায়। হাওরে পানি এলে ধান না থাকায় বেঁচে থাকার জন্য হাওরের মানুষদের মাছের উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই তারা চুপি চুপি মাছ ধরে। কাউকে ধরতে পারলে ইজারাদার জালসহ তাকে আটকে রাখে। শেষে চৌকিদারকে টাকা দিয়ে মুক্তি মেলে তাদের। আগে নিয়ম ছিলো জাল যার মাছ তার। এখন সরকারের কাছ থেকে হাওর লিজ নেয় নেতারা। হাওরের মানুষের মতে, এখন পয়সা যার ক্ষমতা তার। আগে ভাসান পানির মালিক কেউ ছিলো না। রুকুর দাদার সংলাপে সেটাই উঠে আসে- "আকাশের কোনো সীমানা নেই, মানুষ কেবল জমির সীমানা দিতে চায়। এই দুনিয়ার মানুষ বড় বড় দালান বানাইয়া এটা ওটা বানাইয়া মালিক সাইজা বইসা আছে, অথচ একটা ছোট্ট পিঁপড়া তারও হিস্যা আছে, এ দুনিয়ায় থাকার হিস্যা কে দিব? মালিক সাজছে।"

সিনেমাটিতে ক্ষমতা চর্চার দুটি ঘটনা দেখা যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্রঋণ। এই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে চাষের গরু বা ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে যায় এনজিও এর লোকজন। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতাসীনরা হাওর ইজারা নেয়ার ফলে গ্রামের মানুষজন হাওরে মাছ ধরে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টাটাও করতে পারেনা। এক্ষেত্রে হাওরের অসহায় নিরীহ মানুষদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষমতাধররা।

হাওর যখন পানিতে ভাসমান, তখন নৌকা নিয়ে ফেরিওয়ালা নিত্যপণ্য ফেরি করে বেড়ায়। বাড়ির কাছে আলু, পেঁয়াজ, তরকারি ইত্যাদি ফেরি করে। এই ফেরিওয়ালাই আবার এসময়ের সংবাদ বাহক। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে তারা নৌকায় সওদা নিয়ে যাতায়াত করে। ফলে রুকুর মাও তার কাছ থেকে অন্য গাঁয়ে বসবাসরত নিজের মা বাবার খবর জানতে চায়। খবর না পেয়ে স্থবির হয়ে বসে থাকে পানির ধারে। ফেরিওয়ালার নৌকা চলে যাবার দৃশ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান বাজে, "সোনা বন্ধুরে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। গগনেতে নামিল দেয়া, আসমানে হইল আন্দি রে বন্ধু, সোনা বন্ধুরে, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি। তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি, মধ্যে শুরু নদী, সেই নদী কেমনে হইল অকূল জলধি, আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি"।

রুকুর মা তার চাচীর সাথে দুঃখ করে বলে হাওরের পানি তাদের ধান, ঘরের মাটি, ঘরের মানুষ সব নিয়ে গেছে। পরিবারের কর্মঠ পুরুষ যখন হাওরের পানিতে হারিয়ে যায় তখন রুকুর মা বলে "ঘরে একজন পুরুষ না থাকলে কাজে ঢক থাকে না। কামাই রুজি কে করে? এ সংসারে কার উপর নির্ভর করবে?" উত্তরে তার চাচী বলেন, সুলতান যে তাদের সংসারে এসেছে, সেটাও একটা পরিবর্তন। নাওয়ারী নাও আসেনি বলে রুকুর মায়ের আহাজারি দেখা যায়। কিন্তু সেখানকার ধানও হাওরে তলিয়ে গেছে।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এরই মাঝে আনন্দ এবং বেদনা বাইনারি হয়ে চলচ্চিত্রটিতে আসে। ট্রলারে বিয়ে পার্টির গান বাজানো আর নাচের দৃশ্য তাদের নিরানন্দ জীবনে বিনোদন যোগায়। হাওরের উৎসুক জনতা বিয়ের এই যাত্রা দেখতে ভিড় করে হাওরের পাড়ে। এর সাথেই ঘটে শোকবহ এক ঘটনা। যখন তারা ট্রলারের বিয়ে পার্টির নাচ গান দেখায় ব্যস্ত, রুকুর মায়ের ছোট সন্তান আবু হাওরের পানিতে ডুবে যায়। আবুর চলে যাবার দৃশ্যটি রূপকায়িত হয় কতগুলো হাঁসের চলে যাবার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। শোকের মাঝে রুকুর দাদা গান বাঁধেন "বাড়ি বাড়ি কর রে মন, এই বাড়ি তো তোমার নয়, আসল বাড়ি কবর খানা, মাটি হইব বিছানা।" আবু মারা যাবার শোকে মূহ্যমান আবু-রুকুর মা দোষারোপ করে হাওরের পানিকে। বলে, "লক্ষ্মীর ঘরের অলক্ষ্মী আমার পিছ ছাড়ে না। দিন রাত ডাক পারে আর কয়, তোরার ধান নিমু, ঘরের মানুষ নিমু, পোলাপান নিমু... আবুরে পানিত রাইখা আমি কীবা ঘরে ঘুম যাই। পরানডা তো আমার মানে না।" নৌকায় ঘুমোতে যাওয়া সুলতান রুকুর মায়ের এই শোক উপলব্ধি করে। রুকুকে নিজাম ডাকাতের গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ক্রমে পরিবারের সাথে মিশে যায় সুলতান। এই সিকোয়েন্সের আগের এক দৃশ্যে দেখানো হয় রুকুর ছোট বোনকে রান্নাঘরে স্তন্যদান করছেন রুকুর মা। পাশেই গোয়াল ঘরে সুলতানের কাজ করার দৃশ্যটি তাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিকতাকে প্রতীকায়িত করে। আবুর মৃত্যুর আগে গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি, তাকে দেখভাল করতেও দেখা গেছে সুলতানকে। বাজার থেকে আবুর জন্য কোমরের ঘুঙুর কিনে এনেছিলো সুলতান। যাতে শব্দ শুনে আবুর অবস্থান বোঝা যায়। এছাড়াও, মাছ ধরতে গিয়ে রুকুদের পরিবারের চার-পাঁচজন মানুষের খাবার কোত্থেকে আসবে সেই ব্যাকুলতা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে সে। সংলাপটি দূর থেকে রুকুর মায়ের কানে ভেসে আসে। রুকুর মা স্বস্তি বোধ করে। তিনি বুঝে যান, তার পরিবারের অভিভাবকত্বের জায়গাটি সবার অগোচরে নিতে শুরু করেছে সুলতান।

এই সিনেমার প্রধান নারী চরিত্র রুকুর মা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে এখানে প্রথমে চাচীর মাধ্যমে কথা বলতে শোনা গেছে। কিন্তু পরবর্তীতে সুলতানের সাথে কথা বলতে তার মধ্যে আর কোন জড়তা দেখা যায়নি। হাওর অঞ্চলের নারী তার নিজস্ব পরিবেশে ছিলেন অত্যন্ত সাবলীল। বিধবা হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ থেকে সে দূরত্ব বজায় রাখেনি। বরং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে।

ক্রমে পানি নেমে যায়, শাপলা ফোটে, পাখিরা চড়তে থাকে আর চর জেগে ওঠে হাওরে। শাপলা-শালুকের খোঁজে রুকুর দলের চর জুড়ে পদচারণা দেখা যায়। হাওরের পানির ডাক শোনা যায় না, ঝিম ধরে বসে থাকে পানি। রুকুর দাদার সংলাপে হাওরের নতুন রূপের সাথে পরিচয় ঘটে দর্শকের। তিনি বলেন, এমন কিছুদিন থেকে মাটি ভেসে উঠবে, অবশেষে পৌষ মাসে হাওরের মাটি ধান লাগানোর উপযুক্ত হবে। এসময় ঘরে খাবার নেই বলে গরু বিক্রি করতে চায় রুকুর দাদা। প্রতিবেশী চাচীর কাছে চাল চেয়েও পায় না রুকুর মা। এটা প্রকৃত নিদান কাল হাওরে। কাজ নেই বলে সুলতান এসময় চলে যেতে উদ্যোত হয়।

হাওরের অভাবের পর্যায়ে সুলতান চলে যেতে চাইলেও পারে না। সুলতান রুকুর দাদাকে বলে "এখানে কাজ কাম নেই, আপনাদের খাবার জোগাড় করাই কষ্ট। সেখানে আমি থাকলে অতিরিক্ত কষ্ট।" কারণ সে চুক্তিতে আসা। কিন্তু সুলতানের যাওয়ার কথা শুনে ব্যথিত রুকুর মা বলে যে, তার স্বামী মারা গেছে, আবুকে পানিতে নিয়েছে তাকে কীভাবে ধরে রাখবে তারা? সুলতান তো দূর দেশের মানুষ। রুকুও চায় সুলতান থেকে যাক তাদের পরিবারে। সুলতানের হাতে থাকা ব্যাগ থেকে রুকু ফেলে দেয় কাপড়চোপর। রাগ করে দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় হাওরের দিকে। পরে রুকুর পিছু নেয় সুলতান ও তার মা। একসময় রুকুর কাছে পৌঁছে যায় তারা। রুকু তার মাকে বলে, "মা কুড়া পক্ষী, হাওর যখন ডুবে যায়, তখন উড়াল দিয়ে অন্য জায়গায় যায়। যেখানে খাবারের কোনো অভাব নাই। কুড়া পক্ষীর কত্ত সুখ।" তারাও কুড়াপক্ষী হলে উড়ে চলে যেতো। যখন চুলায় আগুন জ্বলে না, ঘরে ধান থাকে না, সেসময় তারা দূরে চলে যেতো। একথায় অসহায়

বোধ করা রুকুর মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি ভেবে পান না এই নিদান কালে তার কী করা উচিত। রুকু তার মাকে বলে সুলতানকে থাকতে বলে লাভ নেই কারণ সে তাদের ছেড়ে চলে যাবে। রুকুর কথায় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এই পরিবারে তার অবস্থানের গুরুত্ব বোঝে সুলতান। তাই সে জানায় "তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না।"

এক পর্যায়ে রুকুর মা ও সুলতানের বিয়ে হয়। তারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে থাকে। রুকুর মা একজন বিধবা নারী আর তাদের পরিবারে কর্মঠ পুরুষের অভাব ছিলো। সুলতানেরও আপনজন বলতে কেউ ছিলো না। ফলে কাজের সন্ধানে আসা সুলতান একজন আগুন্তুক হলেও তার সাথে মায়ের বিয়ে, রুকুসহ তার দাদা ও অন্যান্যরা খুব সহজেই মেনে নেয়। দেখে মনে হয় এ যেন আরাধ্যই ছিলো যে রুকুর মায়ের সাথে সুলতানের বিয়ে হবে। হাওরের মানুষও তাদের বিয়ে সহজভাবে মেনে নিয়ে আনন্দে সামিল হয়।

এই চলচ্চিত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর রাধারমণের গান রয়েছে। রাধারমণ দত্ত রচিত একটি অল্প-শ্রুত ধামাইল গান, যা ব্যবহার করা হয়েছে বিয়ের সিকোয়েন্সে।

যাও গো দূতী পুষ্পবনে পুষ্প আনো গিয়া
আমি সাজাইতাম বাসর শয্যা প্রাণবন্ধুর লাগিয়া।।
কাঁচা কাঞ্চন পুষ্প আন গো তুলিয়া
আন টগর মালী সনধ্যামালী বকফুল ভরিয়া।।
বিকশিত ফুলের মধু হইয়া গেলো তিতা
কোন প্রাণে গেলা বন্ধু পান্থ হারা হইয়া।।
ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
এগো প্রভাতকালে আসবে ঘরে, সই গো ফুলের মধু খাইয়া।
অবশ্য আসিবা বন্ধু ফুলের মধু খাইয়া।।

ধামাইল গান ও নাচ মূলত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওর জনপদে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে, ধর্মীয় উৎসবে, জন্ম ও বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। মহিলারা সামনে পিছনে-এগিয়ে অথবা বৃত্তে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে পরিবেশন করেন এ গান। সংগীতের লয় রক্ষা করা হয় হাততালি বা 'থাপড়ি' দিয়ে। আর নাচের গতি ও তাল রক্ষা করা হয় ডান ও বাঁ পায়ের আগু-পিছু মুদ্রায়। ধীর লয়ে শুরু হলেও আস্তে আস্তে এর গতি বৃদ্ধি পায় এবং অতিদ্রুত লয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। এ চলচ্চিত্রে সংগীতায়জন ও আবহসংগীত ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপরের দৃশ্যে, সুলতান ও তার স্ত্রী দশ হাজার টাকা ঋণ নিতে চায় বেশি জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ করবে বলে। এনজিওর কর্মকর্তা তাদের আইডি কার্ড ও ছবি দিতে বলে। সেই সাথে এনজিওর সদস্য হওয়ার জন্য এক হাজার টাকা দিতে বলা হয়। সদস্য হওয়ার পরই শুধুমাত্র তারা টাকা নিতে পারবে। টাকা নেওয়ার পর প্রতি সপ্তাহে ৬০০ টাকা করে মোট ২৪ সপ্তাহে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। হাওরে ধান চাষ করার জন্য জমি প্রস্তুত করা হয়। রোপন, বপন দুটো পদ্ধতিতেই চাষ করা হয় জমি। লক লক করে ধান বেড়ে উঠতে থাকে। ধান যেনো ঘরে তুলতে পারে সেজন্য হাওরের মানুষ তেল সন্ধিপূজা করে। পূজোর ডালা সাজিয়ে ধানের পাতায় চিহ্ন একে পূজো করে তারা। ধানের গোছ ভালো হওয়া, ধানের থোর বের হওয়া, লম্বা, পুষ্ট ধান হবার জন্য এই পূজা করে হাওরের ঘরের লক্ষ্মীরা। রুকুর মা বলে শাস্ত্রে আছে, মা লক্ষ্মীর বরে ধন আসে ঘরে। রুকুর দাদা বলে দূরদূরান্তে বারবার হাওরে ধান দেখতে যাওয়া যায় না। ঘরের লক্ষ্মীরা এ পূজো দিতে গিয়ে ধান কাটার হিসেব আন্দাজ করে আসে। ধান কাটা নিয়ে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে হাওর অঞ্চলে।

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শীষে বিশ
নোয়াইলে বারো
শাইল গোছে টেপি
কাটতে পারো।

এর অর্থ, শীষ বের হবার বিশ দিন পর পুষ্ট হয়ে নুইয়ে গেলে, তারও বারো দিন পর ধান কাটা যেতে পারে। পূজো করার সময় একজন সনাতন ধর্মাবলম্বীর পাশে রুকুর অবস্থান হাওর অঞ্চলে অসাম্প্রদায়িকতাকেই নির্দেশ করে। সুলতানও তার জমিতে বান্ধ (ফসল না হবার জন্য তান্ত্রিক দিয়ে মন্ত্র পড়া) দেয়। একটি জনপদের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার বৃহৎ ধর্মবিশ্বাসের সাথে মিলে মিশে বহুরঙা ছবির মত প্রতিভাত হয়েছে এখানে। যাকে এরিক উলফ (১৯৬৬, পৃ: ১০৩) বলছেন 'সিনক্রেটিজম'। যেমন- ধানের শীষ যখন পুষ্ট হয়ে আসে, তখন তেলসুন্দি পুজো করতে হয় যাতে পরমা দেবী শস্যভাণ্ডার দেখেশুনে রাখেন। এছাড়াও সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়তে পড়তে জমির আল ধরে হেঁটে যায় এবং পুরো হাওর এক অমাবস্যা থেকে আরেক পূর্ণিমায় বেঁধে ফেলে। ভালো ধান পাবার জন্য এসব করা হয়। সন্ন্যাসী তার মন্ত্র পড়ে দৌড়ে বাঁধ দেয় জমি। ধান ক্ষেতে ছাতা মাথায় কাউকে হাঁটতে দেখে রেগে যায় রুকুর দাদা। বলে, চৈত্র মাসের রোদ সহ্য করে ডীগা ধান আস্তে আস্তে পেকে যায়। ধান ক্ষেতের আইলে ছাতা মাথায় দেয়া হলো ধানের অসম্মান করা। এ এক পবিত্র লোক-বিশ্বাস। বৃদ্ধের সংলাপে সেটাই স্পষ্ট "ধানক্ষেতে ছাতা মাথায় কে রে? চৈত মাসের রোদ সহ্য করে ধান পাকে। ধান যদি রোদ সহ্য করতে পারে তুমি পারতা না ক্যান?" তাঁর মতে, রিজিকের সর্বনাশ হয় এতে। এখানে আরবী 'রিজিক' শব্দটি ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উঠে এসেছে যার অন্বয় ঘটেছে বিভিন্ন জনসংস্কৃতির সাথে।

বারণের মেলার বা পণাতীর্থ এর কথাও বলে বৃদ্ধ। এ মেলা হাওর অঞ্চলের বিচিত্র সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করেছে। এতো কিছুর পরও শেষ রক্ষা হয় না। মেঘ ঘনায়, বৃষ্টি নামে আর পানির ঢল আসে। বাঁধ দেবার চেষ্টা করা হয়। উলু ধ্বনি দেয় সনাতন ধর্মের মানুষেরা। ধান কাটার আর দশদিন বাকি থাকতেই সলিল সমাধি ঘটে তাদের স্বপ্নের।

চিত্র ১: ডুবে যাওয়া ধান নিয়ে সুলতানের কান্না

সব পাকা ধান হাওরের পানির নিচে তলিয়ে যায়। সুলতানকে দেখা যায় পানির নিচে ডুব দিয়ে ধান কাটতে। পরক্ষণে ধান জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়তে। অশীতিপর বৃদ্ধ বলে, "ক্ষেতে আধ পাকনা ধান রাইখা রাইতে ঘুমাইছি, সকালে ঘুম থেইকা উইঠা শুনি সব ধান পানির নীচে।" পত্রিকায় খবর বের হয়, ঢলের পানিতে ধান তলানোর খবর। কিন্তু এ খবর আসলে হাওরের মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাবার খবর। উপরন্তু, সাহায্যের নামে ঋণের বোঝা প্রান্তিক মানুষকে আরো প্রান্তিক আর সর্বস্বান্ত করে দেয়।

চিত্র ২: মাকড়সার জালের ভেতর দিয়ে দেখা রুকুর মায়ের কষ্টে ভেঙে পড়া দৃশ্য

প্রত্যেক বছর 'নিদান কালে' মানুষ শহরে চলে যায়। শহরে কাজের অভাব নেই। গ্রামের অনেকেই গেছে, তাদের কাছে গেলে একটা কাজের সন্ধান পাওয়া যাবে। একটি দৃশ্যে মাকড়শার জালের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, জং পড়া ভাঙা টিন দিয়ে ঘেরা চুলার ধারে বসে আছে রুকুর মা, সামনে একরাশ ধোয়া। এ যেন তার অস্পষ্ট ভবিষ্যতের চিহ্ন। শেষ দৃশ্যে দরোজায় তালা দিয়ে থই থই পানিতে ট্রলার ভাসায় তারা। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় রুকুর মা, কান্না জড়ানো কণ্ঠে তার শেষ উক্তি ছিল চাচি, 'আমার ঘরডা দেইখা রাইখো... আমি ফিরা আইমু... আবার ফিরা আইমু।'

চিত্র ৩: সুলতানের পরিবারের শহরমুখী যাত্রা

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র হিসেবে 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' এর সার্থকতা, বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র হিসেবে এর অবস্থান এবং নব্য-উদারনৈতিকতার সাথে এই চলচ্চিত্রের সংশ্লিষ্টতা পরিমাপ করা হবে।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়াঃ নব্যবাস্তবতা আর নব্যউদারনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র

বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রগুলো (realist cinema) বাস্তব জীবনের একটি সত্যিকার প্রতিফলন। প্রকৃত স্থান, প্রাকৃতিক আলো এবং স্বাভাবিক সংলাপের ব্যবহার এখানে দেখা যায়। এক্সপ্রেসনিস্ট চলচ্চিত্র (expressionist cinema) বা অভিব্যক্তিবাদী চলচ্চিত্র একটি বিশেষ ধারার চলচ্চিত্র যা ১৯১০ থেকে ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে। এই চলচ্চিত্রগুলো আবেগ, মানসিক অবস্থার ভেতরকার দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করে। এখানে অভিনয়ে বা নাটকীয়তায় অতিরঞ্জন দেখতে পাওয়া যায়। জে ডুডলি এন্ড্রু ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত "দ্য মেজর ফিল্ম থিওরিজ" বইতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রের তত্ত্বগুলো বোঝার চেষ্টা করেছেন। এগুলো হলো, ক) কাঁচামাল খ) পদ্ধতি ও কৌশল গ) ফর্ম ও আকার এবং ঘ) উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ। যে তত্ত্বসমূহ কাঁচামাল এর উপর জোর দেয় সেগুলো আসলে রিয়ালিস্ট ঘরানার। যেসব চলচ্চিত্রকাররা তাদের ক্ষমতা দিয়ে বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তারা এক্সপ্রেসনিস্ট ঘরানার। আর এই দুইয়ের বাইরে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত রাজনৈতিক, সামাজিক উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ বোঝার জায়গাটি বর্তমানে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। রিয়ালিজমের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও রিয়ালিজম বা বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র নিয়ে আঁদ্রে বাজিন এবং সিয়েগফ্রিড ক্রাসুয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। বাজিন, ক্রাসুয়ের এর মতো চলচ্চিত্র এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি সরল সমীকরণ করেন না, বরং উভয়ের মধ্যে আরও সূক্ষ্ম সম্পর্ক বর্ণনা করেন যেখানে চলচ্চিত্রটি বাস্তবতার উপসর্গ, একটি কাল্পনিক রেখা যা জ্যামিতিক বক্ররেখার কাছে আসে কিন্তু কখনও স্পর্শ করে না। বাজিনের কাছে বাস্তবতা, সৌন্দর্যের চেয়ে মনোবিজ্ঞানের বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্দ্রে বাজিন নিওরিয়ালিজমকে মানবিকতার সাথে যুক্ত করে তাকে চলচ্চিত্র নির্মানের স্টাইল বলছেন। বাজিন বিশ্বাস করতেন যে চলচ্চিত্র বাস্তবতার একটি প্রতিফলন এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। জ্যাঁ-লুক-গডার্ড আবার বাস্তববাদের সীমাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা প্লাস্টিক বাস্তবতা বা মনোস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দিকে মনোনিবেশ না করে বরং বৌদ্ধিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয় (Monaco 1977, p. 315-31)। সেদিক থেকে "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" একটি বাস্তবধর্মী বা রিয়ালিস্ট ঘরানার ছবি। পরিচালক ও কাহিনীকার মোহাম্মদ কাইউমের মূল লক্ষ্য ছিলো হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের প্রকৃত সত্য ধারণ করা। বাংলাদেশের হাওর এমন এক জনপদ যেখানে একটি মাত্র ফসল উৎপাদিত হয় আর বছরের নয় মাস এই অঞ্চল পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এই চলচ্চিত্রটি হাওরপাড়ের মানুষের জীবন-জীবিকার ন্যারেটিভ, একই সাথে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের জীবিকার সংকটের কথা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে কীভাবে প্রান্তিক মানুষেরা টিকে থাকে চলচ্চিত্রটি তারও আখ্যান।

বিশ্লেষণের এই অংশে আলোকপাত করা হবে 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রটির এথনোগ্রাফিক চরিত্র নিরুপণ এবং নৃতাত্ত্বিক লেন্সে তা পর্যবেক্ষণ করা। প্রথমেই আসা যাক সময়কালে। দীর্ঘদিন একটা সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে সেই সংস্কৃতিকে লিখিত রূপ দেয়াই এথনোগ্রাফি। মোটাদাগে কোন এলাকার সংস্কৃতি সুগঠিত হওয়া এবং স্থিতিশীল হবার জন্য দীর্ঘসময়কাল যেমন প্রয়োজন তেমনি সেই সংস্কৃতিকে একদিন বা দু'দিনে পড়ে ফেলাও সম্ভব নয়। 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রটি তৈরি করতে সময় লেগেছে চৌত্রিশ মাস। এ সময়কালে হাওরসংলগ্ন মানুষের বিচিত্র জীবনাচরণ ফুটে উঠেছে চলচ্চিত্রটিতে। পাশাপাশি হাওর অঞ্চলের ঋতুগুলোর উপস্থিতি এবং পরিবর্তন, বিশেষত পৌষ, চৈত্র, বৈশাখ,আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসগুলোর বিচিত্রতা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটি তাই পরিচালকের দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফসল।

এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্রকে নৃবিজ্ঞানীরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন? Fadwa El Guindi এর মতে চলচ্চিত্র এবং ফটোগ্রাফি নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণত দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। প্রথমত দর্শন মাধ্যমের কাজগুলোর

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ethnographicness এর মান কতখানি এবং দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার বা বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি রয়েছে তা পরিমাপ করার নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিও এই প্রশ্নের সাথে যুক্ত (El Guindi ২০০৪, পৃ: ৭)। সোল ওর্থ (১৯৬৯) বলেছেন, এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র হলো একগুচ্ছ চিহ্নের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে জানা, যা কখনো একটা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্য রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কখনও সংস্কৃতির তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮)। সেদিক থেকে হাওর অঞ্চলের দিন-রাত, ঋতু, গান, বিয়ে, খাদ্যসংস্থান, রুক্ষ প্রকৃতিরতাণ্ডবত্রাসে এই বিশেষ জনপদের মানুষের অসহায়ত্ব সমস্তই যেন রেকর্ড করেছেন মোহাম্মদ কাইউম। নৃবিজ্ঞানী কার্ল হেইডার তার "*এথনোগ্রাফিক ফিল্ম* (২০০৬)" বইতে[৪] একটা এথনোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য মাপার ছাঁকনি "attribute dimension grid" (২০০৬ , পৃ. ১০৯) ব্যবহার করেছেন যা দিয়ে একটা চলচ্চিত্রের "Ethnographicness" পরখ করা সম্ভব। নীচের ছকটির মানদণ্ডে তিনি একটি চলচ্চিত্রের এথনোগ্রাফিকনেস পরীক্ষা করেছেন।

1	Appropriateness of sound	শব্দের উপযুক্ততা	
2	Narration	বর্ণনা	
3	Ethnographic basis	নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি	
4	Explicit theory	স্পষ্ট তত্ত্ব	
5	Relation to printed materials	মুদ্রিত উপকরণের সাথে সম্পর্ক	
6	Voice:point of view	ভয়েস: দৃষ্টিকোণ	
7	Holism: Behaviour contextualization	হলিজম: আচরণের প্রাসঙ্গিককরণ	
8	Physical Contexualization	শারীরিক কনটেক্সুয়ালাইজেশন	
9	Reflexivity: The Ethnographer's presence	রিফ্লেক্সিভিটি: এথনোগ্রাফারদের উপস্থিতি	
10	Whole acts	পুরো কার্যপ্রক্রিয়া	
11	Narrative stories	আখ্যানমূলক গল্প	
12	Whole bodies	পুরো শরীর	
13	Whole interactions	সম্পূর্ণ মিথস্ক্রিয়া	
14	Whole people	সম্পূর্ণ মানুষ	
15	Distortion in the filmmaking process	চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচ্যুতিকরণ	
15a	Inadvertant distortion of behavior	আচরণের অনিচ্ছাকৃত ভিন্নরূপ প্রদর্শন	
15b	Intentional distortion of Behaviour	আচরণের ইচ্ছাকৃত ভিন্নরূপ প্রদর্শন	
15c	Explanation of Distortions	বিচ্যুতিকরণের ব্যাখ্যা	
16	Culture Change	সংস্কৃতি পরিবর্তন	

[৮] ১৯৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এই ছকের মাধ্যমে হেইডার এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্রকে একটি রেকর্ড বা তথ্য সংরক্ষণ বলতে চেয়েছেন। ছকটির আলোকে বলা যায় শ্রবণ ও দর্শনের সামঞ্জস্য, দর্শনের ব্যাখ্যা, এথনোগ্রাফিক উপাদান, বিস্তৃত তথ্য রেকর্ড, ঐতিহাসিক সত্য ইত্যাদি নানারকম উপাদান থাকা উচিত এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্রে। পাশাপাশি Ethnographic Film as Record এর ক্ষেত্রে ফিল্ম এজ ডাটা বা চলচ্চিত্রটিই তথ্য (Film as Data) এবং তথ্যের জন্য রেকর্ড করা (Filming-for-data) এই দুটো বিষয়ের পার্থক্য নিরূপন জরুরী। কারণ প্রথমটি হেইডার এর মতে নাইভ এথনোগ্রাফি (Naïve Ethnography) ঘরানার। পরের অংশটির জন্য একজন নৃবিজ্ঞানী অবশ্যই তার জ্ঞান ব্যবহার করবেন। তবে হেইডারের শর্ত হলো এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র নির্মাণে এথনোগ্রাফারের উপস্থিতি থাকতে হবে যা "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত।

পি কেরিম ফ্রিডম্যান বলেন, বর্গ নির্ণয়ের জন্য একটি চলচ্চিত্রের শুধু এথনোগ্রাফিকনেস নয় বরং এর এথিকস (নীতি-নৈতিকতা) এবং বিষয়াবলীর উপরেও জোর দিতে হবে। আবার, নৃবিজ্ঞানী জে. রুবি এথনোগ্রফিক চলচ্চিত্রকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কিছু বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। জে. রুবির মতে এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকতে হয়। যেমন:

(১) এথনোগ্রাফিক কাজের প্রধান ফোকাস হতে হবে একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির বর্ণনা বা এই সংস্কৃতির কিছু সংজ্ঞায়িত ইউনিট (২) এথনোগ্রাফিক কাজ একটি অন্তর্নিহিত বা স্পষ্ট তত্ত্ব দ্বারা অবহিত করা আবশ্যক যেগুলো এথনোগ্রাফির ভেতরকার বিষয়গুলো কেন বিশেষভাবে নির্দেশিত তার নির্দেশনা দেয় (৩) একটি এথনোগ্রাফিক কাজে এথনোগ্রাফারের গবেষণা পদ্ধতি থাকতে হবে এবং (৪) এথনোগ্রাফিক কাজ একটি স্বতন্ত্র শব্দকোষ হবে, নৃবৈজ্ঞানিক ভাষা বা কোন বিশেষ শ্রেণী গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করবে।

এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র নির্ণয় করার সময় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে তা হলো রিফ্লেক্সিভ নৃবিজ্ঞান বিষয়ে জে. রুবির ভাবনাসমূহ। চলচ্চিত্রে রিফ্লেক্সিভ হবার অর্থ শুধুমাত্র নিজ-সম্বন্ধনীয় প্রতিচ্ছবি নয়। বরং এখানে রিফ্লেক্সিভ হবার অর্থ হলো চলচ্চিত্র নির্মাতা ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর দর্শকশ্রোতার কাছে অন্তর্নিহিত জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতর্কসমূহকে দৃষ্টিগোচরীভূত করান। যা তাকে [নির্মাতাকে] নির্দিষ্ট প্রশ্নের একটি সেট প্রণয়ন করতে সহায়তা করে, প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য একটি নির্দিষ্ট উপায় তিনি বের করেন, এবং অবশেষে এর ফলাফলটি তিনি একটি বিশেষ উপায়ে তাঁর দর্শকের সামনে হাজির করেন (রুবি, ১৯৮০, পৃ. ১৫৭)। এই প্রক্রিয়ায় দর্শক চলচ্চিত্রটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন।

রুবির সমৃদ্ধশালী কাজগুলো থেকে আরো একটি তত্ত্বের সন্ধান মেলে। তা হলো একজন প্রশিক্ষিত এথনোগ্রাফার বা নৃবিজ্ঞানী দ্বারা অবশ্যই একটি এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র নির্মিত হবে (রুবি, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৬০)। জে. রুবির তত্ত্ব অনুযায়ী এটা প্রতীয়মান যে, এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্রের নানারকম উপাদানসমূহ যেমন - একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বর্ণনা, বিশেষ ভাষা, রিফ্লেক্সিভিটি (নির্মাতা যা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন) ইত্যাদি শর্ত পূরণ করলেও 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রটি সবগুলো শর্ত পূরণ করেনি। তার মধ্যে অন্যতম হলো এটি কোন নৃবিজ্ঞানীর তৈরি এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র নয়।

মার্কাস বাংকস এর মতে, একটি চলচ্চিত্রে কী ধরনের তথ্য প্রকাশ করা হবে এবং কতখানি করা হবে সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ (বাংকস ১৯৯২, পৃ. ১২১)। লুসিয়ান কাস্টিং-টেলর ১৯৯৬ সালে "আইকনোফোবিয়া" শিরোনামের একটি গবেষণাপত্রে হেইডার এবং রুবির মতো পণ্ডিতদের লেখায় লোগোকেন্দ্রিকতার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন : "যতদিন নৃবিজ্ঞানীরা [এই বিশ্বাস] ধরে রাখবেন যে, ভাষা হলো নৃবিজ্ঞানের জন্য

প্যারাডিগম্যাটিক প্রক্রিয়া, ততদিন নৃবৈজ্ঞানিক পিকটোরিয়াল-ভিজ্যুয়াল মুড বা 'নৃতাত্ত্বিক চিত্র-দর্শন' ধরনটি শুধুমাত্র তার অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়েই একটি [আলাদা] অস্তিত্ব লাভ করবে, এবং তা শুধু [ভাষা থেকে] নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমেই (টেলর, ১৯৯৬, পৃ. ৮৫)। কাস্টিং-টেলর তর্ক করেছিলেন যে, "চলচ্চিত্র হলো সরাসরি অভিজ্ঞতার গীতিকবিতার মতো কিছু ক্যাপচার, যা কিনা টেক্সট এর মাধ্যমে করা সম্ভব নয় (প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮)।"

আবার এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র চেতনামূলক প্রতীতী তৈরি করতে পারে। David MacDougall বলেছেন যে, ইমেজ বা প্রতিকৃতিগুলো এমন কিছু করতে পারে যা 'শব্দ' পারে না। তাঁর মতে চলচ্চিত্র হলো প্রথমত সেলুলয়েডে ফটোগ্রাফিক ইমেজ। তিনি বলেন, প্রতিকৃতির সক্ষমতা হলো তা আমাদের এবং অন্যদের জীবনের শরীরী অস্তিত্বে পুনরায় প্রবেশ করার (reenter) অনুমতি দেয় - যেমন আমরা সবাই, সামাজিক জীব হিসাবে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ফর্ম (আকার) এবং টেক্সচারগুলিকে (স্পর্শীভূত বিন্যাসকে) একীভূত করি, বুঝে ওঠার আগেই জিনিসগুলো শিখি, অন্যদের সাথে অভিজ্ঞতাগুলো ভাগ করে নিই এবং আমাদের চারপাশের বিচিত্র সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলাচল করি (MacDougall , ২০০৫, পৃ. ২৭০)। 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রটি আমাদের ভেতর সেই অনুভূতি তৈরি করেছে। ফলে এই নির্ণায়কে "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" একটি এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র।

এথনোগ্রাফিক ফিল্ম নির্ণয়ে Fadwa El Guindi এর মতামতটি "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া"র ক্ষেত্রে সবচেয়ে যথাযথ মনে হয়েছে। এল গুইনডি বলছেন, ডকুমেন্টারি ফিল্ম হলো ভিজ্যুয়াল এনথ্রপোলজির মতো কিন্তু এর উৎস নৃবিজ্ঞান নয়। কাজেই চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি-স্টাইলের গবেষণার সাথে কাছের সম্পর্ক তৈরি করেছে, কেননা এথনোগ্রাফিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাছের যোগসূত্র তৈরি করে। বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী যেমন মার্গারেট মিড, জর্জ বেইটসন, এলানোর লিককরা চলচ্চিত্রের সাথে সংযোগ কমিয়ে এথনোগ্রাফির সাথে বৈজ্ঞানিক সংযোগ তৈরি করছিলেন। এগুলোর দর্শন নানা ধরনের উপাত্তের বর্ণনার দিকে পরিচালিত করে। এল গুইণ্ডি তিন ধরনের উপাত্তের কথা বলেছেন: প্রথমটি হলো, এথনোগ্রাফিক ফিল্ম বা চলচ্চিত্র। দ্বিতীয়টি হলো, গবেষণাধর্মী চলচ্চিত্র বা রিসার্চ ফিল্ম, এবং তৃতীয়টি হলো, ভিজ্যুয়াল এথনোগ্রাফি।

এথনোগ্রাফিক ফিল্ম বা চলচ্চিত্র যে শুধুমাত্র নৃবিজ্ঞানীরা তৈরি করবেন তা নয়, কিন্তু নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করার মাধ্যমে এগুলো তৈরি করা হয়। এটা সাধারণত চলচ্চিত্রকাররা কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালের 'দ্য লাস্ট ট্রেইন হোম' সিনেমার কথা বলা যায়। এটা পরিচালনা করেছেন লিক্সিন ফ্যান, একজন চাইনিজ-কানাডিয়ান ফিল্ম মেকার যিনি কিনা চীনে মডার্নাইজেশনের সময়কালে জন্মেছেন। চলচ্চিত্রটি গুয়ানডং প্রদেশের গুয়াংজো থেকে আসা একটি চীনা পরিবারকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে, যারা চীনা নতুন বছরে বাড়ি ফিরছিল। আর এটা হলো চীনাদের সবচেয়ে বড় অভিবাসনের সময়। শিল্পায়িত শহরের ডেনিম ফ্যাকটোরিতে কাজ করা বাবা মায়ের সন্তানদের পুরোনো প্রজন্মের পুরষানুক্রমিক (hereditary) বাড়ি দেখানো হয়েছে। ফ্যান নিজে একজন নৃবিজ্ঞানী না হয়েও চলচ্চিত্রের জন্য যে পরিবেশ ব্যবহার করেছেন তাকে রোক্রানা ওয়াটারসন বলছেন "Built Environment"। রোক্রানার মতে বিল্ট এনভায়রনমেন্ট হলো সাংস্কৃতিক আবেগ। তাদের পৈত্রিক বাড়ি এবং শাখা বাড়িগুলো, যেগুলো তাদের উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন স্থানে তৈরি করেছে, বাড়ির একটা ক্রমধারা তৈরি করেছে। এরই মধ্যে কন্যা জিন ঘোষণা করে যে সে শহরে পড়াশোনা এবং পিতামাতার মতো চাকুরি করতে চায়। এই যূথবদ্ধতার আবেগটিই, যারা পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে শহরে চাকুরির জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন তা তাদের সন্তানদের অনুভব করাতে চেয়েছেন। এই ডকুমেন্টারিটি তাদের যৌথ পরিবারের আবেগ এবং সাফল্যকে তুলে ধরেছে।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় ধারার ডিজিটাল তথ্যসমূহ হলো গবেষণাধর্মী চলচ্চিত্র বা রিসার্চ ফিল্ম। বস্তুনিষ্ঠ লেন্স এবং বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রত্যক্ষবাদ দৃষ্টিভঙ্গির (positivism) মাধ্যমে এথনোগ্রাফারদের সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য মার্গারেট মিড এই ধারার চলচ্চিত্র নির্মান করেছিলেন। প্রত্যক্ষবাদে বৈজ্ঞানিকভাবে তথ্য উপাত্তকে যাচাই করা যায়। গবেষক দৃশ্যগুলোতে কখনো কখনো নিজেই পোজ দিয়ে থাকেন অথবা সেগুলো চিত্রায়ন করা হয় একস্পটে, একটা সিঙ্গল শটের জন্য, যাতে নিরপেক্ষভাবে বিষয়াবলী সংগ্রহ করা যায়।

আমাদের ভেতরকার চিন্তা-চেতনা আমাদের চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। এমনই একটি রিসার্চ ফিল্ম হলো 'পিপলস পার্ক' (২০১২)। যেখানে আটাত্তর মিনিটের সিঙ্গেল শট এর মাধ্যমে পার্ক একটিভিটিসগুলো বা কার্যাবলী দেখানো হয়। শেষে সামাজিক বিজ্ঞানীরা একে বিশ্লেষণ করেন।

শেষ ধরনের ভিজ্যুয়াল তথ্য হলো ভিজ্যুজ্যুয়াল এথনোগ্রাফি। এল গুইনডি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, ভিজ্যুয়াল এথনোগ্রাফি হলো গবেষণার হাতিয়ার। দর্শন নৃবিজ্ঞান দৃশ্যগত অথবা বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ নয়। এগুলো সাংস্কৃতিগত এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত রয়েছে, এর মধ্যে লুকায়িত থাকে নিয়মনীতি এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ। দর্শন নৃবিজ্ঞানীরা এথনোগ্রাফিক পদ্ধতিগুলো, গবেষণার একটি ফর্ম হিসেবে ফিল্ম তৈরির জন্য, বিনির্মানের জন্য, এবং বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। দর্শন নৃবিজ্ঞানীরা ভিজ্যুয়াল এথনোগ্রাফি তৈরি করে থাকেন। তাঁরা যে গবেষণা করেন তা ফিল্মে ধারণ করেন এবং এডিটিং শেষে ডকুমেন্টারি-স্টাইল-এথনোগ্রাফিক-ফিল্ম তৈরি করেন। সিনেমাটিক এবং সাইন্টেফিক অনুশীলনকে এখানে একত্র করা হয়। গবেষণার জন্য ভিজ্যুয়াল নৃবিজ্ঞানীরা ফিল্ম তৈরি, ডিকনস্ট্রাক্ট এবং বিশ্লেষণ করতে নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন (Baker, 2021- Present)।

এই তিন ধারা বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান যে, 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' উপরোল্লিখিত প্রথমধারা অর্থাৎ এথনোগ্রাফিক ফিল্ম এর অন্তর্গত। এই চলচ্চিত্রে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে হাওর অঞ্চলের জীবনধারা ফুটে উঠেছে। এই চলচ্চিত্রটি কোন নৃবিজ্ঞানীর তৈরি নয় কিন্তু একটি বিশেষ এলাকার মনুষ্যজীবনের নিবিড় বর্ণনা। পরিচালক দীর্ঘসময় হাওরাঞ্চলে অবস্থান করেছেন। ফলে সেখানকার সকাল, সন্ধ্যা, রাত, বৃষ্টি ও ঢলের দৃশ্যসমূহ ও ঋতুর পরিবর্তন, ফসল উৎপাদন, বিচিত্র সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ, আচার ও ধর্মবিশ্বাস, অসাম্প্রদায়িকতা এবং অভিবাসন নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। ফলে এটি একটি তথ্যচিত্রও বটে। সিনেমা জুড়ে শব্দগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মতো। বৃষ্টি বা নদীর ঢেউয়ের শব্দগ্রহণ, আবহসংগীত ও সংগীতায়োজন ছিল অসাধারণ। আগেই বলা হয়েছে এ চলচ্চিত্রে কোন ডাবিং করা হয়নি। সরাসরি শ্যুটিং লোকেশনে রেকর্ড করা হয়েছে। ফলে তা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয়েছে। সিনেমার লোকেশন বৃহত্তর হাওর অঞ্চল সুনামগঞ্জ ছিল গল্পের প্রেক্ষাপটে যথার্থ। তবে এর চিত্রায়ন ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। রূপসজ্জার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে মানুষ ঠিক যতটা নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে ঠিক তেমনটাই উপস্থাপন করা হয়েছে। মেকাপে অতিরঞ্জন দেখা যায় নি। নারীরা সাধারণত শাড়ি, সালওয়ার কামিজ পড়েছেন কিন্তু শাড়ি পড়ার ঢংটি আধুনিক অথবা এক প্যাঁচে দুভাবেই দেখা গেছে। পোস্ট প্রডাকশনের ক্ষেত্রে বলা যায় অডিও এবং ভিডিও এর মিশ্রণ এর ফলে সংলাপগুলো একদম বাস্তব মনে হয়েছে। কালার গ্রেডিং আর এডিটিং এর মানও উন্নত মানের।

অভিবাসন এই চলচ্চিত্রের একটা অন্যতম বার্তা। জলবায়ুর কারণে হাওর অঞ্চল থেকে অভিবাসিত হওয়াকে ক্লাইমেট মাইগ্রেশন বা জলবায়ু অভিবাসন বলা হয়। স্থানচ্যুতির আরো দুটো কারণ দেখতে পাই এই চলচ্চিত্রে। একদম শুরুতে প্রথমত: জীবিকা নির্বাহের জন্য অভিবাসন। দ্বিতীয়ত আত্মীয়ের (সৎ মা) দ্বারা

নিগৃহীত হবার ফলে অভিবাসন। আত্মীয় দ্বারা নিগৃহীত হবার ফলেও মানুষ অভিবাসিত হয় (Mahboob 2022, pp. 70-71)। নিজের বাসস্থান ছাড়ার আগে সুলতানের, "মাও নাই যার, দুনিয়াতে আপন বলতে কেউ নাই তার, আইজকে মা থাকলে নিজের ঘরবাড়ি আপন মানুষ ছাইড়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না" সংলাপটি যেনো সেটাই মনে করিয়ে দেয়।

"কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" একটি বাস্তবধর্মী বা রিয়ালিস্টিক চলচ্চিত্র। কেননা এই চলচ্চিত্রের কাহিনিতে মূলত হাওরের প্রান্তজনদের দুঃখ-কষ্টের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘকাল প্রায় সাড়ে তিন বছর এই অঞ্চলের পরিবেশ ও জনমানুষের উপর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন পরিচালক। পাল্টে যাওয়া ঋতু, প্রকৃতির সাথে সাথে পাল্টে যাওয়া জীবন-কাহিনী এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাওরের মানুষের দুঃখ, কষ্ট, আর অভাবের চিত্র হৃদয় স্পর্শ করে। বাস্তবধর্মী সিনেমায় রিপ্রেজেন্টেশন বা পরিবেশনের একটি রাজনীতি রয়েছে। পরিচালক কতটা নির্মোহ ছিলেন তা জানা জরুরী। শুটিংয়ের লোকেশন এবং ডাবিং করার ক্ষেত্রটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে, 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া'র ক্ষেত্রে আলাদা করে ডাবিং করা হয়নি। সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে তা রেকর্ড করা হয়েছে (আকবর ২০২২)। এখানে পরিচালক তার উন্মুক্ত (Miss-en-scene) পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন। পুরো সিনেমার চিত্রায়ন করা হয়েছে। ইটালিয়ান রিয়ালিজমের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার অনেকগুলোই এখানে উপস্থিত। সাধারণ মানুষের ভিশন, ডকুমেন্টারি ভিজ্যুয়াল স্টাইল অথবা রিয়েল লোকেশন সবই এখানে বিদ্যমান।

'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হলো নব্য-উদারনৈতিক মতাদর্শের কুফল। উজানে পাহাড়ি অঞ্চলের ভারী বৃষ্টিপাতের পানি আসা ছাড়াও, বাংলাদেশের নদীগুলো অস্বাভাবিকভাবে ভরাট হয়ে যাওয়া, অপরিকল্পিতভাবে সড়ক ও পানি-ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ, বন উজাড় করা, পাহাড় কেটে ধ্বংস করা, ভূমিধ্বস, নদীভাঙন, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদিকে হাওর এলাকার ফসলবিনাশী হঠাৎ বন্যার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রুকুর দাদা বলেন,পাহাড়ি ঢলের পানি আসে হাওরে। এই পানি যে নেমে যাবে তারও উপায় নেই। কেননা মানুষেরা নদী-খাল-বিল ভরাট করছে আর গাছ কেটে ফেলছে আর্থিক বা অন্যান্য কারণে। এসবের কুফল ভোগ করছে হাওরের মানুষ। প্রতিনিয়ত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য কষ্ট করে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের। নব্য-উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক রূপান্তর শুধুমাত্র শ্রম এবং পুঁজির পরিবর্তনশীল সম্পর্ক অথবা অর্থনীতির সমস্যার সাথে যুক্ত নয়। বরং নব্য-উদারনৈতিক মতাদর্শ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তি এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সর্বত্র বিরাজমান। নব্য-উদারনৈতিকতার মতাদর্শ কার্যত মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে। শুধু ঐতিহ্যবাহী শ্রম অনুশীলনের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নয় বরং শহুরে এলাকার ভূগোল, মানুষের অভিবাসন, শিল্প এবং সৃজনশীলতার অনুশীলন, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এবং পারিবারিক জীবন, স্বতঃস্ফূর্ততার ধারণা, ইউটোপিয়া এবং ডিস্টোপিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, আর অবশ্যই জাতি এবং লিঙ্গের কনফিগারেশন বা রূপরেখাকে প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্র নব্য-উদারনৈতিক মতাদর্শকে শুধু প্রতিফলিত করে না, এই মতাদর্শকে তা প্রয়োগও করে বা বিকল্পভাবে কীভাবে এই মতাদর্শকে প্রতিহত করে তাও দেখায়। চলচ্চিত্রের অবশ্যই আবেগপূর্ণ পরিশোষণের ক্ষমতা আছে, আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষমতা আছে বিশেষ প্রধান চরিত্র (প্রোটাগোনিস্ট) বা পরিস্থিতি শনাক্তকরণে বা বিচ্ছিন্নকরণে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের অবস্থান তৈরিতে। কাজেই চলচ্চিত্রের সাথে নব্যউদারনৈতিক মতাদর্শের সম্পৃক্ততা রয়েছে (Cooper, ২০১৯, পৃ. ২৭২)। সুলতানের কাজ পাওয়া, হাওরে দারিদ্রের কষাঘাত, হাওরে এনজিওর উপস্থিতি, সরকারের কাছ থেকে হাওর লিজ নেয়া, নেতার দৌরাত্ম্য, সর্বোপরি পরিবারসহ সুলতানের অভিবাসন সবকিছুতেই যেন এই নয়া-উদারতাবাদের দৌরাত্ম্য বিরাজমান। হাওরের বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণে বেশি গাছ না কাটা, নদী খাল ভরাট

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

করে ঘর-বাড়ি আবাদি জমি মানুষ যেনো তৈরি না করে তেমন একটা বার্তা দেয় 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রটি।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় উজান থেকে আসা প্রবল ঢল ও অকালবৃষ্টিতে যখন হাওরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছিলো, তখন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা (পাউবো) বিপন্ন ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। হাওরের মানুষেরা নিজেরাই বাঁধ নির্মাণ করে। এতে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের দেখা যায়নি সহায়তা করতে। সিনেমার এই তথ্য কতটা বাস্তব তা নির্ণয়ের জন্য দালিলিক তথ্য প্রয়োজন। একটা বিদেশী প্রবাদ দিয়ে শেষ হয়েছে চলচ্চিত্রটি -'ভাগ্যাহতরা হয় ক্ষেপে উঠে, নয়ত কেঁদে মরে'। "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" তাই ভাগ্যহত মানুষের তথ্যগাথা। যদিও চলচ্চিত্রের পরিচালক পেশাদার নৃবিজ্ঞানী নন, কিন্তু এই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা, হাওরবাসীদের মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা, স্থান, সময় ও পরিস্থিতি নিয়ে পরিচালক যে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন তা নৃবৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফিক গবেষণাকে প্রবলভাবে অনুভূত করায়। নৃবৈজ্ঞানিক লেন্সে "কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া" চলচ্চিত্রটি তাই বাস্তবধর্মী ঘরানার একটি সার্থক এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র।

তথ্যসূত্রঃ

English sources

Baker, E. (2021), Visual anthropology part 1: What is visual anthropology? vol2. Ep.1 [vedio podcast] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=JLdBMC0oDdk&t=154s

Banks, M. (1992). Which films are the ethnographic films, in Crawford and D. Turton (Eds.), *Film as Ethnography* (pp. 116-129). Manchester: Manchester University press

Barthes, R. (1964), Rhetoric of the Image, *Communication*, vol 4, 40-51

Cooper, A. (2019). Neoliberal theory and film studies. *New Review of Film and Television Studies*, *17*(3), 265–277. https://doi.org/10.1080/17400309.2019.1622877

El Guindi, F. (2004), *Visual Anthropology: Essential Method and Theory*, Altamira Press, NewYork

Friedman, P. K.erim, (2020), *Defining Ethnographic film*, in Philip, Vannini eds. The Routledge International Handbook of Ethnographic Film and Video, Routledge, London

Heider, K.G. (2006), *Ethnographic Film*, University of Texus Press, Austin

MacDougall, D. (2005). *The Corporeal Image: Film, ethnography, and the senses*. Princeton University Press, New Jersey

Mahboob, S. 2022, *Ethnography of Bangaldeshi Migrants in Iran*, unpublished Ph.D. thesis, Department of Anthropology, University of Tehran, Iran

Monaco, J. (1977), *How to Read a Film: The Art, Technology, Language, History, and Theory of Film and Media*, Oxford University Press, NewYork

Ruby, J. (1975). Is an ethnographic film a filmic ethnography? *Studies in the anthropology of visual communication*, 2(2), 103-111

Ruby, J. (1980). Exposing yourself: reflexivity, anthropology and film. *Semiotica*, 30(1-2). 153-179

Ruby, J. (2005). The last 20 years of visual anthropology – a critical review. *Visual studies*, 20(2), 159-170

Smith, J. A., Flower, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. Qualitative Research in Psychology, 6(4), 346–347. https://doi.org/10.1080/14780880903340091

Taylor, L. (1996). Iconophobia. *Transition*, 69, 64-88

Wolf, E., (1966), Peasants, Prentice-Hall, INC., Englewood Cliyfs, New Jersey

Bengali sources

আকবর, প্রতীক ২০২২, " সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া",
https://www.newsbangla24.com/culture/211795/Cineplex-can-be-seen-flying-in-the-air

আখতার, কাজী রোজানা ২০০০, "হাকালুকি হাওর", দেখুন কালী প্রসন্ন দাস, মোস্তফা সেলিম, বড়লেখা: অতীত ও বর্তমান, ঢাকা: বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড, ঢাকা ১৭৯-১৯২

সৈকত দে. (2022, November 14). 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া: বিপন্ন মানুষের গল্প. The Business Standard. https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4/news-details-119658

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ইকো-ট্যুরিজম: ডিসকোর্স ও চর্চা

রঞ্জন সাহা পার্থ[১]

সারসংক্ষেপ

'ভালো অনুশীলন', 'টেকসই', 'দায়িত্বশীল পর্যটন'—এ তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে ইকো-ট্যুরিজমের বিকাশ ঘটলেও বাস্তবিক অর্থে তার চর্চা কেমন?—এ জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ইকো-ট্যুরিজম প্রেক্ষাপটের এথনোগ্রাফিক অনুসন্ধানই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবেশ ও স্থানীয় সমাজকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইকো-ট্যুরিজম বাস্তবিক অর্থে পরিবেশ সংরক্ষণের চেয়ে মুনাফা ও বাজারব্যবস্থার উপর প্রাধান্য দেয়। উপরন্তু বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে পর্যটক আকর্ষণ করে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের একটি নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইকো-ট্যুরিজমের ব্যানারে পরিকল্পনা ও নীতিমালাবিহীন অবকাঠামো উন্নয়ন, অধিক মাত্রায় পর্যটকের আগমন শুধু পরিবেশের উপরই প্রভাব ফেলছে না, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান প্রান্তিকতাকে পুনরুৎপাদন করছে।

ভূমিকা

ইকো-ট্যুরিজম পর্যটনের এমন একটি ধারণা, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ-সংবলিত পর্যটন এলাকায় পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ, পরিবেশগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং স্থানীয়দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে। ইকো-ট্যুরিজমের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে গণপর্যটনের বিকল্প হিসেবে, যেখানে স্থানীয়, পরিবেশ সুরক্ষার মতো বিষয়াবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পর্যটনের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, যেমন—স্থানীয় জনগণ, প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপিপাসু, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার সংগঠন ও স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণের ধারণাই ইকো-ট্যুরিজম। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে ইকো-ট্যুরিজমের ডিসকোর্স ও চর্চার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জীব ও প্রাণবৈচিত্র্যপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিকভাবে পর্যটন প্রচলিত রয়েছে, যা সাম্প্রতিক দশকে বৈশ্বিক ইকো-ট্যুরিজম ডিসকোর্সের সঙ্গেও যুক্ত। একবিংশ শতকের শুরুর দিকে বিভিন্ন ধরনের 'ইকো-রিসোর্ট', 'ইকো-কটেজ' স্থাপনার মধ্য দিয়ে এখানে ইকো-ট্যুরিজমের সূত্রপাত হচ্ছে, যার পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ইকো-ট্যুরিজম সোসাইটির সংজ্ঞানুযায়ী, ইকো-ট্যুরিজম হলো প্রাকৃতিক অঞ্চলে দায়িত্বশীল ভ্রমণ; যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় মানুষের মঙ্গল সাধন করে (ইন্টারন্যাশনাল ইকো-ট্যুরিজম সোসাইটি, ১৯৯১)। উন্নয়নশাস্ত্র, বিশেষত পরিবেশ-গবেষকগণ বাংলাদেশের ইকো-ট্যুরিজম বিষয়ে গবেষণা সম্পাদন করলেও বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বের অনেক দেশেই নৃবিজ্ঞানীরা ইকো-ট্যুরিজমের ডিসকোর্স ও চর্চা নিয়ে গবেষণা সম্পাদন করেছেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন ধারার তাত্ত্বিক প্যারাডাইমও সুপ্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রতিক দশকে ইকো-ট্যুরিজম ডিসকোর্স আলোচনায় নৃবিজ্ঞানীরা দেখান যে, এটি পর্যটন-ব্যবস্থাপনার এমন একটি ছাতা, যার ছায়াতলে নানাবিধ নব্য-উদারনৈতিক প্রেক্ষাপট, যেমন— পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ইত্যাদি যুক্ত হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে দিন শেষে এ ডিসকোর্স বাজারব্যবস্থার উপর জোর দেয়,

[১] অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: parthoju@juniv.edu

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে পর্যটক আকর্ষণ করে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের একটি নব্য উদারনৈতিক মানসিকতার সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

অন্যান্য দেশের নৃবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা আমার এ গবেষণামূলক প্রবন্ধের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ইকো-ট্যুরিজম ডিসকোর্সের মাধ্যেমে 'পরিবেশ সংরক্ষণ' ও 'স্থানীয় মানুষের মঙ্গল সাধন' বিষয়াবলি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা এথনোগ্রাফিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ইকো-ট্যুরিজমের ব্যানারে প্রাকৃতিক স্থানগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে পর্যটক আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনমানুষের অংশগ্রহণ সীমিত; বরং প্রভাবশালী ব্যক্তি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। স্থায়ী কোনো নীতিমালা না থাকার কারণে এমনিতেই পর্যটক, স্থানীয় মানুষ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে; উপরন্তু ইকো-ট্যুরিজম বিজ্ঞাপনের ভাষায় পরিণত হয়েছে, যেখানে স্থানীয় পরিবেশ, প্রকৃতি, জনমানুষের বাস্তবতা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। প্রথাগত পর্যটনের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশ ঘটলেও বাস্তবিক অর্থে নতুন এ ডিসকোর্স পুরোনো সীমাবদ্ধতাসমূহেরই পুনরুৎপাদন ঘটাচ্ছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

ইকো-ট্যুরিজমের ডিসকোর্স ও চর্চা শিরোনামের এ প্রবন্ধেটি ২০২১ সাল হতে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়কালে কতগুলো ধারাবাহিক গবেষণা হতে তথ্য সংগ্রহের আলোকে লিখিত। বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যটন স্থানে গবেষণার মূল মাঠকর্ম সম্পাদিত হয়। তবে গবেষণাটি একক কোন স্থানে সম্পাদিত হয়নি, পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ির বিভিন্ন পর্যটন স্থানেও গাবষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আমার পিএইচডি গবেষণাও ছিল পার্বত্য চট্টগামের শান্তি চুক্তি (Chittagong Hill Tracts Accord, 1997) বিষয়ে। ২০১১-২০১৩ সালে গবেষণাকালে দেখতে পেয়েছি যে, পর্যটন শুধু বিশুদ্ধ ভ্রমণ নয় বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের অবলম্বন নয়; স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভোগান্তিরও বিষয়, ক্ষেত্রবিশেষে দ্বন্দ্বেরও কারণ (পার্থ, ২০২১)। এই প্রবন্ধের কিছু তথ্য-উপাত্ত ইউএনডিপি-র একটি গবেষণার অংশবিশেষ, গবেষণাটি ২০২১ সালে আমি ইউএনডিপি-র অর্থায়নে সম্পাদন করি। গবেষণার প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল, ইকো-ট্যুরিজম কীভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যুবকদের কর্মসংস্থান করতে পারে, তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। গবেষণার মূল ফিল্ড বা মাঠ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার। এ ছাড়াও ইকো-ট্যুরিজম স্পট হিসেবে সুন্দরবন, টাঙ্গাইল, গাজীপুরে ভাওয়াল বনেও মাঠকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে পার্বত্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য জায়গার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা-পদ্ধতি ছিল গুণগত, যেখানে অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। হোটেল ও রিসোর্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, পর্যটক, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাঁদের মতামত দিয়ে গবেষণার তথ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে মূল গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে এথনোগ্রফিক। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে গুনগত গবেষণার নিবির স্বাক্ষাৎকার, ফোকাসগ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যদাতার নাম পরিচয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়নি। মোট কথা গবেষণাটি ২০২১ থেকে শুরু করে লেখকের বিভিন্ন পর্যায়ের বেশ কয়েকটি পর্যায়ের গবেষণার তথ্য ও সামগ্রীক অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত। আর গবেষণার স্থান/ মাঠও তাই 'মাল্টি সাইটেড' (মার্কাস, ১৯৯৫)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণা পদ্ধতি কোর্স শিক্ষক থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মধুপুর, গাজীপুর, মৌলভীবাজার ইকো-ট্যুরিজম এলাকায় মাঠ পরিদর্শণে যাবার অভিজ্ঞতা, মাঠকর্মকালীন

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথোপথন, পর্যটন বিষয়ে তাদের অন্তর্দৃষ্টি আমার এই গবেষণা প্রবন্ধ ও তার যুক্তি দাড়করণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে একাডেমিক প্রবন্ধ লেখার সময় প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রবন্ধের তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সেকেন্ডারি লিটারেচার একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে দেশব্যাপী ইকো-ট্যুরিজমের বিস্তার নিয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সে প্রতিবেদনসমূহ প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে ভূমিকা রাখে। দৈনিক পত্রিকা, টিভি চ্যানেলের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনসমূহের প্রধান বিষয়বস্তুও এ গবেষণার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। দেশব্যাপী ট্যুরিজমের নামে যে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিবেদনসমূহও এ গবেষণার তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাহিত্য-পর্যালোচনা

হেক্টর সেবালাস ল্যাসকুরেন ১৯৮৩ সালে মেক্সিকোতে 'প্রোনাচারা' (Pronatura) নামক এনজিও প্রতিষ্ঠার সময় ইকো-ট্যুরিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। হেক্টর লক্ষ করেন যে, পর্যটক, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে এক জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে পরিবেশ-আন্দোলনের মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজমের প্রয়োজনীয়তা শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইকো-ট্যুরিজম সোসাইটি (১৯৯১)-এর রিপোর্ট মোতাবেক, ইকো-ট্যুরিজম হলো প্রাকৃতিক অঞ্চলে দায়িত্বশীল ভ্রমণ; যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় মানুষের মঙ্গল সাধন করে। 'ইকোট্যুরিজম' শব্দটির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে: 'ভালো অনুশীলন' (good practice), 'টেকসই' (sustainable) ও 'দায়িত্বশীল পর্যটন' (responsible tourism)। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় ইকো-ট্যুরিজমকে 'bursting the bubble' হিসেবে আখ্যা দিয়ে দেখানো হয় যে, ইকো-ট্যুরিজম ডিসকোর্সটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ছাতার (umbrella) মতো কাজ করার কথা থাকলেও তা অর্থহীন ছাতায় (meaningless umbrella) পরিণত হয়েছে (ক্যারিয়ার, ২০০৫)।

যখন পর্যটন চকচকে পোস্টার-ব্যানার ও রঙিন গল্প তৈরি করে, নৃবিজ্ঞান সেখানে পর্যটন এলাকার দৈনন্দিন জীবনের সঠিক প্রতিকৃতি প্রদানের চেষ্টা করে। ইকো-ট্যুরিজমের বাস্তবতা বলতে গিয়ে মজা করে তাঁর প্রবন্ধে লিখেন,

> ইকো-ট্যুরিজম চর্চা অনেক সময় নিজেই পরিবেশের উপর চাপ ফেলতে পারে; এ চর্চাগুলো নিজের অজান্তেই পরিবেশের ক্ষতি করে। যেমন: দূরদূরান্ত থেকে যানবাহনে ভ্রমণে করে পরিবেশবান্ধব জায়গায় গিয়ে একজন পরিবেশবাদী প্রকৃতিপ্রেমীও যে যানবাহনের ধোঁয়া দিয়ে পরিবেশ ক্ষতি করছে, সে দিকগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়।

স্ট্রোন্জা (২০০১) দেখান যে, ইকো-ট্যুরিজমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এক্টিভ এজেন্ট নয়, বরং প্যাসিভ রেসিপিয়েন্ট হিসেবে আবির্ভূত করে। আর মোট কথা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেহেতু শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গীয় দিক থেকে সমরূপ নয়, তাই ইকো-ট্যুরিজমে সবার অংশগ্রহণের মাত্রাও সমান নয়।

ইকো-ট্যুরিজম নিওলিবারেল নীতিমালার মধ্যে পণ্যবিন্যাস, খরচ ও সুবিধা বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু এটি পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবেশনের কথা বলে, তাই এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ বা সমালোচনা করা কঠিন করে তোলে। বরং এটি 'স্থানীয় সম্প্রদায়, বৈশ্বিক এনজিও, দাতা ও IFIs-সহ জটিল পরিসরের স্বার্থ-গোষ্ঠীর কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থন পায়' (ডাফি, ২০০২)। ক্যাথলিন (১৯৯৯: ১৩৩) এটিকে একটি 'উত্তর-উদারবাদী

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশগত-অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত' বলে অভিহিত করেছেন, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর পর্যটনের মাধ্যমে মুনাফার জন্য ইকো-ট্যুরিজমের নামে "প্রকৃতিকে ব্যবহার করবে", এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত শোষণমূলক পুঁজিবাদী সম্পর্ক জোরদার করবে।

ফুকোর দৃষ্টিকোণ থেকে, এ অধীনতাকে 'সরকারিতা' (governmentality) (ফুকো, ১৯৯১), বিশেষত 'নব্য উদারবাদী সরকারিতা' (neo-liberal governmentality) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটি নিয়ম ও মূল্যবোধের এমন একটি মিথস্ক্রিয়া, যেখানে 'পরিকল্পনাবিদদের অত্যধিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে (যেমন—তহবিল সরবরাহকারী, স্থানীয় প্রতিনিধি, ভোক্তা বা পর্যটক, প্রশাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠী) স্বনিয়ন্ত্রিত করে' (ফ্লেচার, ২০১৮)। আগরওয়াল (২০০৫: ১৬১) দেখিয়েছেন যে, পরিবেশগত সুরক্ষার নিরীক্ষণ ও প্রয়োগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ভারতীয় গ্রামবাসীরা পরিবেশগতভাবে সচেতন ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, যাকে আগরওয়াল 'পরিবেশগততা' (environmentality) হিসেবে আখ্যা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ইউদেলিস (২০১৩) ইকো-ট্যুরিজমের বিপরীত যুক্তিকে হাইলাইট করে। ইকো-ট্যুরিজম তার সমগ্র স্টেকহোল্ডারকে শৃঙ্খলামূলক পরিবেশ এবং নব্য উদারবাদী পরিবেশের মধ্যে, সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন পলিসির অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করে।

নৃবিজ্ঞানী বুপসটিন পর্যটনকে 'একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চের ছদ্ম-ঘটনার সিরিজ প্রযোজনা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন (বুরস্টিন, ১৯৬৯)। এরই ধারাবাহিকতায় ডালগ্লিশ (২০১৮) ইকো-ট্যুরিজমকে পর্যটন বিকাশের জন্য ম্যাজিক বুলেট 'magic bullet' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশ সংরক্ষণে বাজারব্যবস্থার উপর জোর দেয় আরও বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে পর্যটক আকর্ষণ করে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের একটি নব্য উদারনৈতিক মানসিকতার সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইকো-ট্যুরিজম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর কাছে আবেদন সৃষ্টি করে, কারণ এটি একই সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন ডিসকোর্সেও বৈশ্বিক এজেন্ডাগুলোকে সম্বোধন করে, যেমন: 'পুঁজিবাদী উন্নয়ন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পরিবেশসুরক্ষা' (ডাফি, ২০০৯: ৩১৪)। এগুলো নিওলিবারেল পলিসির সাথেও গভীরভাবে যুক্ত। এটি পর্যটনের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাত (দাস ও চ্যাটার্জি, ২০১৫) এবং অনেক ক্ষেত্রে পর্যটন-প্রকল্পগুলোকে ইকো-ট্যুরিজম হিসেবে লেবেল করা হয়েছে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য অথবা প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন সংস্থা ও সরকারি তহবিল আকর্ষণ করার জন্য এবং পর্যটন উন্নয়ন নীতিগুলোকে বৈধতা দেওয়ার জন্য (ক্যারিয়ার ও ম্যাকলেয়ড, ২০০৫)। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণে, 'ইকো-ট্যুরিজম'কে একটি লেবেল ও ব্র্যান্ড হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলাফল হলো স্পট এবং প্রকল্পগুলোর বিস্তার বা তার টেকসই ও দীর্ঘস্থায়িত্বের নীতিকে সমর্থন না করেই অথবা পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত না করেই ইকো-ট্যুরিজম নামটি গ্রহণ করে (গ্রে ও ক্যাম্পবেল, ২০০৭)। এ বিষয়ে ব্রাজিলের কফিচাষিদের বিজ্ঞাপনের ব্যবহারকে সামনে নিয়ে আসা যেতে পারে। ব্রাজিলের কফিচাষিদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় কফির অর্গানিক বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য; আবার কখনো কফিচাষ এলাকায় পর্যটন বিকাশের জন্য। কিন্তু চাষিদের অভাব, দুর্দশা কখনোই বিজ্ঞাপনে প্রচার পায় না বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশে প্রকৃতিকে বিজ্ঞাপনে প্রচার করলেও পর্যটন কীভাবে স্থানীয় পরিবেশ, সংস্কৃতি বা রিসোর্ট স্থাপনে যে উচ্ছেদ সংস্কৃতি, সে বিষয়গুলো আড়ালেই থেকে যায়।

ক্যারিয়ার ও ম্যাকলেয়ড (২০০৫: ৩২৯) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্যের ফেটিশাইজেশনের মার্কসীয় ধারণাকে উদ্ধৃত করেছেন: "পণ্যটিকে এমনভাবে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করার প্রবণতা, যা সামাজিক সম্পর্ক ও পরিস্থিতিগুলোকে অস্পষ্ট করে, যা এটিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে এবং সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে"। এ একই প্রবণতা ইকো-ট্যুরিজমের মধ্যে বিদ্যমান (ক্যারিয়ার ও ম্যাকলেয়ড, ২০০৫)। সুরক্ষিত এলাকা ও উন্নয়ন-প্রকল্পগুলো খুব কমই স্থানীয় জনগণের স্থানচ্যুতি এবং সমস্যাসমূহকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপন দেয় যে, সমস্যাগুলো মূলত ইকো-ট্যুরিজমের ফলেই সৃষ্ট।

কোনো কোনো স্থানে প্রকৃতির উপর পর্যটকের কী রকম চাপ পড়বে, প্রকৃতি ও স্থানীয় মানুষ কতটুকু পর্যটকের চাপ নিতে পারবে—সে বিষয়ে গবেষণা ছাড়াই ইকো-ট্যুরিজম প্রসার লাভ করছে। যেমন, মেক্সিকোতে বাহিয়া ম্যাগডালেনার মতো জায়গায় ইকো-ট্যুরিজম কার্যকলাপ হিসেবে তিমি দেখার জনপ্রিয়তা প্রকৃতি ও পরিবেশের ধারণক্ষমতার দিকে নজর দেয় না; স্থানীয় পণ্যের সরবরাহের চেয়ে পর্যটকদের চাহিদার দিকে পরিচালিত করে। নৌকার ট্রাফিক ও ধারণক্ষমতা কতটা বেশি হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। এক সঙ্গে এক ডজন নৌকা ও নৌকা ভর্তি পর্যটকের উপস্থিতি পরিবেশ ও তিমির আচরণের উপর কী রূপ প্রভাব ফেলে তার উপর কোনো গবেষণা নেই (দাস ও চ্যাটার্জি, ২০১৫)। স্থানীয় অবকাঠামোর অভাব বর্জ্যনিষ্কাশন, জনস্বাস্থ্য-সমস্যা ও পরিবেশগত ঝুঁকির সমস্যা তৈরি করে। কিন্তু এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শুধু পর্যটন ও উন্নয়নের সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করা হয়, যা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সামুদ্রিক বাসস্থানকে হুমকির সম্মুখীন করে (ইয়ং, ১৯৯৯)। এখানে আবার ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়—এটি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য বাজারের নীতির উপর নির্ভর করে, বাজার সম্প্রসারণকে প্রাধান্য দেয়, যা পর্যটকরা যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো দেখতে আসে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য একেবারেই একটি 'ম্যাজিক বুলেট', কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অধ্যয়ন ছাড়া এটি একেবারেই টেকসই নয়।

ইকো-ট্যুরিজম একটি প্রভাবশালী বৈশ্বিক মতাদর্শ হিসেবে নব্য-উদারনীতিবাদ স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রথাগুলোকে বাজারের নীতির অধীন করে, যা অস্থিতিশীল করতে পারে এবং সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হতে পারে। এমনকি যদি ইকো-ট্যুরিজম লেবেলটি ভুলভাবে ব্যবহার না করা হয়, তবুও উদ্যোগগুলো টেকসইভাবে পর্যটকদের আগমন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হতে পারে, বা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের উপর ইকো-ট্যুরিজমের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।

নীতি অনুযায়ী ইকো-ট্যুরিজম আশা করে এ ধরনের পর্যটন পরিবেশকে রক্ষা করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিবেশগত সম্পদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা অনুশীলনগুলো এর প্রতিকার করতে পারে, যদিও তারা নিজেরাই প্রভাবশালী নব্য-উদারবাদী আখ্যানের চাপের মধ্যে পড়ে আছে। তবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যখন প্রভাবশালী নব্য-উদারবাদী আদর্শকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, তখনই তারা এটি থেকে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে কিছু ব্যক্তি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবিধা লাভ করে (বেলস্কি, ১৯৯৯)। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ইকো-ট্যুরিজমের বিকাশ কি স্থানীয় সরকার, জনগোষ্ঠী, বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো, পরিবেশ নীতিমালা—এ সকল বিষয়াবলির ওপর শ্রদ্ধাশীল বা এসব স্টেকহোল্ডার সমন্বিত কোনো নীতিমালা গ্রহণ বা প্রণয়ন করেছে? এ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা এ প্রবন্ধের আলোচ্য।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্লেচার (২০১০: ১৭৮) উল্লেখ করেছেন যে, ইকো-ট্যুরিজম ও নিও-লিবারেলিজমের সমালোচনার মধ্যেই আমরা শাসনের একটি নতুন রূপ খুঁজে পেতে পারি। এটি হবে একটি 'উন্নয়ন-পরবর্তী' (post-development) যুগ, যা মানুষের সাংস্কৃতিক কল্যাণের জন্য সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক এবং সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়। এটি এস্কোবারের (১৯৯৯) সাংস্কৃতিক সংকরায়ণের (cultural hybridity) ধারণাকে সমর্থন করে, যা প্রকৃতি ও সংস্কৃতির নতুন বিরোধিতাবাদী শাসনের সূচনা করে। এ ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নতুন উপায় স্থাপনে নতুন সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত থাকা এবং পুরোনো দ্বিধাবিভক্তি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব পর্যটন এলাকায় প্রকৃতি ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে প্রকৃতির ঐশ্বরিক সৌন্দর্য উপভোগ, উপলব্ধি ও অধ্যয়ন করাই হলো ইকো-ট্যুরিজম। ইকো-ট্যুরিজম বা পরিবেশগত পর্যটনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে গভীরভাবে জানার ও বোঝার সুযোগ থাকে। পর্যটনের এ ধারণা এসেছে পরিবেশের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভাবনা থেকেই। এটি পর্যটনকে শুধু বিনোদনের খোরাক না ভেবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ধারণার শিক্ষা দেয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম নামে পর্যটন গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু জীববৈচিত্র্য ও প্রাণবৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা, সেখানে নানামুখী পর্যটন ইকো-ট্যুরিজম নামে বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—পার্বত্য চট্টগ্রামে ইকো-ট্যুরিজমের যে বিকাশ, তা ইকো-ট্যুরিজম ডিসকোর্সের সাথে কতটুকু মানানসই? ইকো-ট্যুরিজমের যে মূল উদ্দেশ্য—পরিবেশ সুরক্ষা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, তার কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে?

ইকো-রিসোর্ট কি ইকো-ট্যুরিজমের স্থানীয় রূপ?

সাম্প্রতিক দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য 'ইকো-রিসোর্ট' ধারণার বিকাশ লাভ করে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয়, বন-পাহাড়-নদী-কৃষিজমিকে কেন্দ্র করে এখন ইকো-রিসোর্টের বিস্তার দেশব্যাপী। সুন্দরবন থেকে শুরু করে ভাওয়ালের বন, উত্তরবঙ্গের নদী, এমনকি ঢাকার আশেপাশে খোলা জায়গা ও আরেকটু জলাশয় পেলেই স্থাপনা তৈরি করে নাম দেওয়া হচ্ছে 'ইকো-রিসোর্ট'। পাহাড় ও বনের ভেতরে বাঁশ বা কাঠের বাড়ি দিয়ে এ ইকো-রিসোর্টের সূত্রপাত হলেও বর্তমানে কংক্রিটের ব্যবহার শুরু হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাজেক ভ্যালি ভ্রমণপিপাসুদের জন্য একটি লোভনীয় স্থান, এখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অনেক রিসোর্ট তৈরি হয়েছে। রিসোর্টগুলো শুরুর দিকে ইকো-ট্যুরিজমের আদলে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হলেও, বর্তমানে ইট-কংক্রিটের রিসোর্ট নির্মাণ হচ্ছে। ইকো-ট্যুরিজমের জন্য বিখ্যাত রাঙামাটির সাজেক ভ্যালিতে পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমানে ১৫৪টি কটেজের মধ্যে ৭টি কটেজ ইট-পাথরের, যেগুলো খুবই সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে[২]। এগুলো ইকো-ট্যুরিজম ডিসকোর্সের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। শুধু সাজেক নয়, পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামেই; এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরেও ইট-পাথরের রিসোর্টের মালিকানা প্রভাবশালী 'বহিরাগত' মালিক অথবা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার অধীনে থাকবার কারণে স্থানীয় মানুষ বা প্রশাসন কেউই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এ রকমও দেখা গিয়েছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে, যেমন: বাঁশ ও কাঠ দিয়ে রিসোর্ট তৈরি করা হলেও পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, রাঙামাটির জুমকিং ইকো-রিসোর্টের কথা উল্লেখ করা যায়। রিসোর্টটির থাকার ঘর বাঁশ, কাঠ দিয়ে রিসোর্ট তৈরি করা হলেও যাতায়াতের জন্য পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

[২] ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গবেষণাকালীন তথ্য।

রাঙামাটির একটি রিসোর্টের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ বলেন, "কটেজগুলোকে স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততা বেশ কম। ইকো কটেজের যেসব ধারণা, সব কটেজে তা নেই। কটেজগুলো পাহাড় বা বনের ভেতর তৈরি হচ্ছে, এ জন্য বড়ো বড়ো গাছ কাটা পড়ছে।"

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে আমরা গবেষণাকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যখন রাঙামাটি যাই, তখন দেখতে পাই, বেশকিছু আদিবাসী যুবক রিসোর্টে কাজ করছে। তখন আমরা তাদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, তারা এখানে স্থায়ী চাকরি করে না। ছুটি বা শীতের সময় যখন পর্যটক বেড়ে যায়, তখন কাজের চাপ সামলাতে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হলে তাদেরকে দিনমজুর হিসেবে নিয়োজিত হয়। রান্নায় সাহায্য করা, বাজার করা, পর্যটকের মালামাল বহন করার মতো কাজে তাদেরকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অন্য সময় প্রয়োজন না হলে তারা কাজ পায় না। তার মানে স্থানীয় জনগণ ইকো-ট্যুরিজমে মৌসুমি শ্রমিক হিসেব পরিগণিত হয়।

রাঙামাটির বিদ্যুৎ লোডশেডিং অনেক বেশি হলেও কটেজগুলোতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালিত হয় ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে। স্থানীয় মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের অভাববোধ করলেও কটেজগুলোতে সার্বক্ষণিক আলোর ঝলকানি থাকে, সাথে জেনারেটর, মিউজিক সিস্টেমের উচ্চ শব্দ। এলাকাবাসী জানান, "এসি, গিজার, জেনারেটর, মিউজিক সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার যথেচ্ছ। রাতে ডিজে পার্টি, বারবিকিউ পার্টি নামে উচ্চ শব্দের গান বাজানো হচ্ছে, যা বনের প্রাণী ও স্থানীয় জনগণের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" আবার যেসব কটেজে বাঁশ ও কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে হাই ক্যামিক্যাল রং ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কোনো রিসোর্টে লেকের পাড়ে সিঁড়ি নির্মাণ করেছে। প্লাস্টিক, কৃত্রিম রং, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যত্রতত্র ব্যবহার পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমও ইকো-ট্যুরিজম বিস্তার নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করছে। সেখানে ইকো-ট্যুরিজম বিস্তার বিশেষজ্ঞদের মতামতও তুলে ধরা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রাণবৈচিত্র্য গবেষক পাভেল পার্থর একটি সাক্ষাৎকার এখন টিভিতে প্রচারিত হয়। সেখানে তিনি বলেন, "যেখানে এমন অবকাঠামো নির্মাণের মূল কাঁচামাল আসার কথা প্রকৃতি থেকে, সেখানে এসব ক্ষতিকর কাঁচামাল ব্যবহার হলে পরিবেশ হুমকিতে পড়ে যায়। এগুলো স্থানীয় প্রকৃতি কিংবা সংস্কৃতি উপযোগী নয়, অথচ নাম দেওয়া হয়েছে ইকো-রিসোর্ট।"[৩]

যদিও ইকো-রিসোর্টের ধারণা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয়, ঢাকার আশেপাশের বনাঞ্চল, বিশেষ করে গাজীপুর ও ভাওয়ালের বন এমনকি সুন্দরবনকেন্দ্রিক এ ধারণা বেশ প্রচলিত। ভাওয়াল, সুন্দরবন বা পার্বত্য চট্টগ্রামে, যেখানেই হোক না কেন, এসব জায়গায় বহুতল ভবন, পাকা রাস্তা নির্মাণ করে গাছ কেটে রিসোর্ট নির্মাণ হচ্ছে বলে তা সাম্প্রতিক কালে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও পরিবেশবিদদের সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে। গবেষণার অংশ হিসেবে এ বিষয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফারহানা রহমান এর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তিনি বলেন, "ইকো-ট্যুরিজমের অংশ হিসেবে রিসোর্টগুলো থেকে এলাকার ইতিহাস, প্রকৃতি ও প্রাণ বা জীববৈচিত্র্যের

[৩] ১৭ জুন, ২০২৪ তারিখে *এখন টিভি*তে "ইকো-রিসোর্টে সুউচ্চ দালান?" নামের একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারে ইকো-রিসোর্ট নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে মতামত তুলে ধরেন। *এখন টিভি* প্রতিবেদন https://ekhon.tv/article/66710938cc1ad96ce5d8f945

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাসের সঙ্গে এলাকাবাসী সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা রাখা উচিত, এগুলোই ইকো-ট্যুরিজম। কিন্তু নিছক পিকনিক করতে আসাকে ইকো-ট্যুরিজম হিসেবে চালিয়ে দেওয়া একদমই ঠিক নয়।"

সাবেক প্রধান বনরক্ষক ও প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জোট আইইউসিএ-র সাবেক পরিচালক ইশতিয়াক উদ্দিন আহমেদ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ:[৪] "সুন্দরবন এমনিতেই নানা কারণে বিপদে আছে। এর চারপাশে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠাসহ নানা ধরনের বিপদ বাড়ছে। এখন এভাবে যদি অবৈধভাবে রিসোর্ট তৈরি করে তা চলতে থাকে, তা হলে ভবিষ্যতে সুন্দরবনের অবস্থা আমাদের গাজীপুরের ভাওয়াল বনের মতো হবে। এসব রিসোর্ট আরও নির্মাণের আগে তা বন্ধ করতে হবে। "

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডও স্বীকার করে যে, ইকো-রিসোর্ট কীভাবে নির্মাণ করবে, ব্যবহার করবে, কতটুকু বনকে ব্যবহার করবে—এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই, যা প্রকৃতির জন্য ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।[৫]

পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের মিথস্ক্রিয়া

ইকো-ট্যুরিজম নীতির অন্যতম দিক হচ্ছে পর্যটক এবং স্থানীয় পরিবেশ, সংস্কৃতির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটানো। স্থানীয়রা কীভাবে তার ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান দিয়ে পরিবেশকে সংরক্ষণ করে, তা একজন পর্যটক ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখবে, তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে। ইকো-ট্যুরিজম প্রত্যয়টিই মূলত বিকশিত হয়েছিল পর্যটন যেন পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব না ফেলে, উপরন্তু পরিবেশ রক্ষায় মনোযোগী হয়—সে বিষয়াবলিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ প্রত্যয়টি বাণিজ্যিকভাবে বিস্তার লাভ করছে এবং ইকো-ট্যুরিজমের ব্যানার ব্যবহার করে কীভাবে গণপর্যটন আরও ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করছে—সে বিষয়ের আলোচনা আমরা পূর্বের সাহিত্য পর্যালোচনা অংশে দেখতে পাই। বৈশ্বিক গবেষণার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ইকো-ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে পর্যটক ও স্থানীয় পরিবেশ, সংস্কৃতির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার বিষয়াবলি অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গবেষণাকালে দেখা যায়, যেহেতু এলাকাটি ভূপ্রকৃতি, জনগোষ্ঠী ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশের সমতল ভূমি থেকে আলাদা, তাই সাইট সিয়িং এর পাশাপাশি ইকো-ট্যুরিজমের নাম শুনে অনেক পর্যটক এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আসেন। একজন গ্রামবাসী বলেন,

> সাধারণভাবে কিছু পর্যটক আছেন, যাঁরা প্রকৃতির প্রতি খুব আগ্রহী। এখানকার চারপাশের পরিবেশ, এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চান। তাঁরা পাহাড়ে উঠতে চান পাহাড়ের মানুষের সাথে কথা বলার জন্য। তাঁরা অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেন... এবং আরও কিছু পর্যটক আছেন, যাঁরা জানতে চান পাহাড় বা ঝরনা সম্পর্কে, এর নামকরণ সম্পর্কে, এগুলো নিয়ে যেসব মিথ আছে, সেগুলো সম্পর্কে...

কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত ইকো-ট্যুরিজমে, বিশেষত রিসোর্ট পর্যটনে আসা পর্যটকদের সাথে স্থানীয় মানুষের মিথস্ক্রিয়া ঘটার ব্যাপারটি খুব কম ঘটে। রিসোর্টে এমন কোনো ব্যবস্থাপক রাখা হয় না,

[৪] পূর্বের সূত্রে

[৫] বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের বলেন, "একটি ইকো-রিসোর্ট হওয়ার জন্য যে ধরনের নিয়ম মানতে হবে, সে বিষয়গুলো নির্ধারণ করা দরকার। তারপর মনিটরিং করতে হবে। প্রকৃতিভিত্তিক পর্যটন এলাকাগুলোতে যখন ব্যাপকভাবে পর্যটক যায়, তখন সেটা আর টিকে থাকে না।" https://ekhon.tv/article/66710938cc1ad96ce5d8f945

এমনকি গাইড নিজেও ভালো করে এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে জানে না, কারণ এ পর্যটন-ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উপেক্ষা করা হয়। বিশেষত, বর্তমানে বহুল প্রচলিত প্যাকেজ ট্যুরগুলোয় যেভাবে শুধু সাইট সিয়িং এর মধ্য দিয়ে পর্যটকদের ব্যস্ত রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের বা সংস্কৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার কোনো সুযোগ পর্যটকদের দেওয়া হয় না। প্যাকেজ ট্যুরগুলোর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য তিনদিনের ভ্রমণে সাতটি বা দশটি সাইট ঘুরানোর প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, যেখানে বিখ্যাত পাহাড়,হ্রদ বা ঝরনার ছবির বর্ণনা থাকে, কখনো কখনো আদিবাসীদের ছবি দেওয়া থাকে। কিন্তু এ স্বল্প সময়ে ভ্রমণেই সময় ব্যয় হয়, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ ঘটে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয়রা দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে। এগুলো সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও চর্চা তাদের রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ইকো-রিসোর্টকেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশ লাভ করলেও, পর্যটকদের সৃষ্ট প্রাত্যহিক ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় সরকার, রিসোর্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পর্যটক বা কোনো স্টেকহোল্ডারই ময়লা নিষ্কাশনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। প্রাত্যহিক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে জলাশয়ে, যা ইকো-ট্যুরিজম ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু এসব জলাশয় গ্রামবাসী নিত্যকার প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করে। রিসোর্টের মতো গ্রামের মানুষের বাড়িতে পানির লাইন নেই, জেনারেটর নেই, এসি নেই। গ্রামের মানুষ জলাশয়ের পানিতে গোসল করে, কাপড় ধোয়ার কাজ করে। কিন্তু পর্যটক সে জলাশয়ে ঘুরতে এসে পানির বোতল, চিপ্স-বিস্কুট-চকলেটের খোসা ফেলে নোংরা করে। রিসোর্ট-কর্তৃপক্ষ তার দায়ভার নেয় না। কিন্তু গোসল করার আগে গ্রামবাসী নিজেদের প্রয়োজনে সেগুলো পরিষ্কার করে। গ্রামের মানুষ রাগ করে, কিন্তু ক্ষমতার সম্পর্কের নিম্ন স্তরে থাকার কারণে তারা রিসোর্ট-কর্তৃপক্ষ বা পর্যটকদের কিছু বলতে পারে না, যে কারণে ইকো-ট্যুরিজমের এক্টিভ অংশীদার নয়, বরং প্যাসিভ গ্রহীতা। সাজেকের একজন গ্রামবাসী বলেন, "ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নয়, বরং পরিবেশ ধ্বংসে মাঠে নেমেছে।"

ইকো-ট্যুরিজমের আরেকটি দিক হচ্ছে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রিসোর্ট-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত বেশির ভাগ মানুষই 'বাইরে' থেকে আসা। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র সাজেক তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। সাজেককেন্দ্রিক ইকো-ট্যুরিজমে রিসোর্টের মালিকানা তো দূরের কথা, কর্মী হিসেবেও স্থানীয়দের নিয়োগলাভ খুবই দুরূহ ব্যাপার। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয়, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সমান দৃশ্য। এ বিষয়ে সংবাদপত্রের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়:

> ...খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একটি বাদে সবকটি রিসোর্ট যৌথ মালিকানায় গড়ে উঠেছে। মালিকদের বেশির ভাগই পর্যটন-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের সেন্ট মার্টিন, সাজেক, শ্রীমঙ্গলে রিসোর্ট ব্যবসা আছে। হাওরে হাউসবোটও আছে। নির্মাণাধীন জঙ্গলবাড়ি ইকো রিসোর্টের মালিকানায় আছেন পাঁচটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল গ্রুপের মালিকেরা। তাঁদের একজন জাকারিয়া শাওন *প্রথম আলো*কে বলেন, সুন্দরবনে রিসোর্ট করার ইচ্ছা অনেক আগে থেকেই পর্যটন ব্যবসায়ীদের ছিল। মূলত এখানকার প্রথম দিকের কিছু রিসোর্টের সফলতা দেখেই অন্যরাও আসছেন। (*প্রথম আলো*, ৩ জুন, ২০২৪)[৬]

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, ইকো-ট্যুরিজম নামে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য ও ভূমিবৈচিত্র্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ইকো-ট্যুরিজমের মূল ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, ধারণাটি এসেছে পরিবেশের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভাবনা থেকেই। কিন্তু বাংলাদেশে যথাযথ ইকো-

[৬] এহসান, শেখ আল ও মণ্ডল, উত্তম, "সুন্দরবন ঘিরে একের পর এক রিসোর্ট, চলছে এসি-জেনারেটর", *প্রথম আলো*, জুন ০৩, ২০২৪।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ট্যুরিজম নীতিমালা না থাকা, পরিবেশ সংরক্ষণের যথাযথ জ্ঞান না থাকা ও অতিমুনাফার দিকে ঝোঁক থাকার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ইকো-ট্যুরিজমের আরেকটি দিক হচ্ছে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা। কিন্তু স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানে রিসোর্টগুলো যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ইকো-ট্যুরিজমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ না থাকলে প্রকৃতির উপর বেশি প্রভাব পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ভিন্ন ১২টি এথনিক জনগোষ্ঠীর পেশাগত, ধর্মীয় ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি যুক্ত। সংস্কৃতিগত দিক থেকে তারা অনেকেই জলাধার, পাহাড়, বনকে সুরক্ষিত রাখে। জলাধার, বন অনেকের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত। তারা সেগুলো ব্যবহার করলেও পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণের নিজস্ব জ্ঞান ও পদ্ধতি আছে। ইকো-ট্যুরিজমও প্রকৃতিকে সংরক্ষণের দিকে গুরুত্ব দেয়। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় হতে পারে। ইকো-ট্যুরিজমে যদিও স্থানীয় জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সেরকম অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় না। কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের ইকো-ট্যুরিজমে কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজমের বিকাশ ঘটেনি; বেশির ভাগ প্রাইভেট ও কর্পোরেট মালিকানায়। কমিউনিটি থেকে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর থেকে দূরে থাকার কারণে কমিউনিটির প্রকৃতি সংরক্ষণের জ্ঞান পর্যটনে অবদান রাখতে পারে না। অন্য দিকে কর্পোরেট ও স্থানীয় গোষ্ঠীর যূথবদ্ধতার ভিত্তিতে এখানকার পর্যটন বিকাশ লাভ করতে পারতো; যেমন— রিসোর্টে স্টাফ, ম্যানেজার ইত্যাদি হিসেবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকলে স্থানীয় জ্ঞান পর্যটকদের সঙ্গে ভাগ করতে পারতো। কিন্তু সেগুলো এখানে ঘটছে না। এ জ্ঞানের মিথস্ক্রিয়া না থাকার পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র প্রকৃতিকেই ধ্বংস করা হচ্ছে। অপরিকল্পিত পর্যটন যেখানে প্রকৃতিকে 'অপরিচ্ছন্ন' করে, স্থানীয় মানুষ সেগুলোকে নিজেদের প্রয়োজনে আবার ব্যবহার উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করে।

ইকো-ট্যুরিজমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী একজন যুবক মনে করেন, ইকো-ট্যুরিজম শব্দটি রিসোর্ট-মালিকরা ব্যবহার করছে বিজ্ঞাপনের ভাষা হিসেবে, তাদের ভোক্তা অর্থাৎ পর্যটকদের আকর্ষিত করার জন্য। গবেষণাকালে তিনি বলেন,

> আজকাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্রই ইকো-ট্যুরিজম নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। সেখানে রিসোর্টের ফ্যাসিলিটি, লেক ভিউ, হিল সাইট, সুইমিং পুল, এসি, জেনারেটর সুবিধার কথা জানানো হচ্ছে। কিন্তু কোনো বিজ্ঞাপনে কি বলা হয়েছে যে, পর্যটনে এসে কীভাবে লেক বা পাহাড় পরিষ্কার রাখতে হয়? প্রাকৃতিক পরিবেশ যাতে সংরক্ষিত থাকে?— এ সবকিছুই ব্যবসা। প্রকৃতি নিয়ে ব্যবসা ছাড়া আর কিছু না। একজন পর্যটক যদি পরিবেশ নোংরা করে যায়, পরবর্তীতে যিনি আসবেন, তিনি নোংরা পরিবেশই পাবেন। ধীরে ধীরে পর্যটকরাও ইকো-ট্যুরিজমের নামে পর্যটনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

ইকো-ট্যুরিজমে পর্যটকেরও দায়িত্ব পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা। এক্ষেত্রে ট্যুর গাইড বা প্রতিষ্ঠানগুলোরও দায়িত্ব হচ্ছে তাদের অধীনে যেসব অতিথি বা পর্যটক আসেন, তাঁদেরকে সে বিষয়ে সচেতন করা। এটি ইকো-ট্যুরিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যাকে দায়িত্বশীল পর্যটন হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে দেখা গেছে যে, রিসোর্ট বা হোটেলগুলোতে ময়লার ঝুড়ি ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ময়লা ফেলার নির্দেশিকা থাকলেও দায়িত্বশীল পর্যটন বলতে কী বোঝায়, সাইটগুলোতে সে নির্দেশিকা দেওয়া নেই। এমনও দেখা গেছে, ট্যুর গাইডরাও পরিবেশ রক্ষার্থে কোনো ভূমিকা রাখে না। রিসোর্ট বা হোটেল থেকে বের হয়ে যখন যানবাহন অর্থাৎ নৌকা বা চান্দের গাড়ির মতো স্থানীয় যানবাহনে ট্যুর গাইডের সঙ্গে ভ্রমণ করেন, তখন যানবাহন থেকেই নদী বা রাস্তায় চিপ্‌স, বিস্কুটের প্যাকেট, পানি বা পানীয় দ্রব্যের প্লাস্টিকের বোতল ছুঁড়ে

ফেলেন, যা মোটেও ইকো-ট্যুরিজম বা দায়িত্বশীল পর্যটনের মধ্যে পড়ে না। এক্ষেত্রে ট্যুর গাইডদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, এমনকি পর্যটকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য যানবাহন, রাস্তা, পর্যটনস্থানগুলোতে নির্দেশিকা থাকা জরুরি। আর পার্বত্য অঞ্চলের অতিপর্যটনের কারণে যেন পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়নেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের ডিসকোর্স ও বাস্তবতা

ইদানীং চারপাশে ইকো-ট্যুরিজম শব্দটি বহুলাংশে ব্যবহৃত হলেও সেখানে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও দেখা যায় না। ২০১০ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যে নীতিমালা করেছে, সেখানে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন, বিপণন কিংবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে টাস্কফোর্স গঠনের কথা বললেও ইকো-ট্যুরিজমের সংজ্ঞায়ন কিংবা সেটা কীভাবে হবে, তার গাইডলাইন বা নির্দেশিকা নেই।

যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই সংবেদনশীল এলাকা বা বাস্তুতন্ত্রে পর্যটন বৃদ্ধি আসলে বাস্তুতন্ত্র ও এর প্রজাতির ক্ষতি করতে পারে, কারণ রাস্তার মতো পর্যটন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এ ধরনের প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভাওয়াল বন, লাউয়াছড়া বন, সুন্দরবনের প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করছে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে একজন স্থানীয় মানুষ বলেন,

> সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সুন্দরবনকেন্দ্রিক যে অল্প কিছু পর্যটনের বিকাশ হতে দেখছি, তার সিংহভাগের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। বরং আমরা দেখছি, পর্যটনের নামে লঞ্চ বা ইঞ্জিনচালিত বড়ো নৌকা অবাধে সুন্দরবনের খালগুলোয় প্রবেশ করছে। পানি ও পরিবেশদূষণের সঙ্গে শব্দদূষণও ঘটছে।

প্রথমত, বনের ইকোসিস্টেম ঠিক রেখে জনগণের চলাচল নিশ্চিত করা ইকো-ট্যুরিজমের শর্তের মধ্যে পড়লেও পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিমাত্রায় রিসোর্ট, হোটেল, কটেজ নির্মাণ হচ্ছে। যে কারণে পর্যটনকে কেন্দ্র করে বন-জঙ্গল, গাছপালা কেটে অবকাঠামো গড়ে তোলার ফলে জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে ইকো-ট্যুরিজমে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। 'বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন' প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার আগে ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ দর্শনার্থী বনে আসতেন; কিন্তু এখন আসছেন ৮৭ দশমিক ৯ শতাংশ দর্শনার্থী। অর্থাৎ আগে পর্যটন মৌসুমে দিনে গড়ে ১৪ জন মানুষ এলেও বর্তমানে দিনে গড়ে ১১০ জন আসেন, যা আগের তুলনায় আটগুণ বেশি[৭] ।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সচেতনতা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। কিন্তু স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো ইকো-ট্যুরিজম দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অন্য ধরনের পর্যটনের ক্ষেত্রে, ইকো-ট্যুরিজমের ফলে পর্যটক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সংঘাত হচ্ছে। খাগড়াছড়ির অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পর্যটকরা বেড়াতে এসে যদি যত্রতত্র ময়লা ফেলে, উচ্চ শব্দ করে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে রাতে পার্টি করে, তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যার সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদ করলে সংঘাত ঘটে। কিন্তু রিসোর্ট, হোটেলের মতো ক্ষমতাশালীরা পর্যটকদের পক্ষ অবলম্বন করে, স্থানীয় প্রশাসনও

[৭] সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, বিস্তারিত দেখুন https://thefinancialexpress.com.bd/views/columns/promoting-ecotourism-to-secure-tourist-hotspots-1533053480

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিরাপত্তা দিতে পর্যটকদের পক্ষ নেয়। অসহায় গ্রামবাসী সংঘাতের কথা চিন্তা করে এখন প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়।

তৃতীয়ত, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ইকো-ট্যুরিজমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলেও রিসোর্ট বা হোটেল নির্মাণের জন্য আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষমতা স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নেই। কিছু এলিট ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী আদিবাসীর রিসোর্টের মালিকানা রয়েছে। ভ্রমণ মৌসুমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী মৌসুমি রান্না-বান্না, ভ্যানচালক কিংবা ট্যুরিস্টদের কাছে মৌসুমি ফল বিক্রি করে যে আয় করছে, সেটাকে ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন দেখিয়ে এটাকেই অনেকে ইকো-ট্যুরিজম হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে।

সংজ্ঞানুযায়ী ইকো-ট্যুরিজম ঐতিহ্যবাহী পর্যটন থেকে ভিন্ন, কারণ এটি ভ্রমণকারীকে এলাকা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কিত ও অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে, বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণকে এখন ইকো-ট্যুরিজম হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হচ্ছে। এগুলোর বেশির ভাগই প্রকৃতপক্ষে ইকো-ট্যুরিজম নয়। কারণ তারা পরিদর্শন করা স্থানগুলোতে সংরক্ষণ, শিক্ষা, কম প্রভাব ভ্রমণ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের উপর জোর দেয় না। স্থানীয় রাজনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক জলবায়ু সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইকো-ট্যুরিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটকদের ধারণক্ষমতা কত, একজন পর্যটক কত টাকা খরচ করে ভ্রমণ নিশ্চিত করতে পারবে, কী উপায়ে পর্যটক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি বিধান করা যাবে, এসব বিষয়ে কোনো গবেষণা ছাড়াই ইকো-ট্যুরিজম নামে পর্যটন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরিকল্পিত পর্যটনের কারণে পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্ষতি ছাড়াও স্থানীয় সমাজের মানুষজন উচ্চ দ্রব্যমূল্য, বাড়িভাড়া, যানবাহনের চাপ, সামাজিক চাপে পতিত হচ্ছে। অপরিকল্পিত পর্যটন এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতাকে পুনরুৎপাদিত করছে।

ইকো-ট্যুরিজমের নামে 'অতিপর্যটন'

বিশ্বব্যাপী অতিপর্যটনের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে স্থানীয় সমাজ ও পরিবেশের উপর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বললেও তা একভাবে অতিপর্যটনকেই উৎসাহিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়।

নানা কারণে স্থানীয় সমাজে পর্যটনের বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত মাত্রায় পর্যটকের আগমন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাধারণত ছুটির মধ্যে অনেক পর্যটক আসে। ঈদ বা অন্যান্য বড়ো ছুটিকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমাগম হয়, যা ধারণার বাইরে। রিসোর্ট বা হোটেলে ধারণক্ষমতা থাকে না। খাবার চাহিদাও বেড়ে যায়। অতিরিক্ত পর্যটক আগমনের ফলে দ্রব্যের জোগানের তুলনায় চাহিদা বহু গুণ বেড়ে যায়। স্থানীয় বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। পর্যটকরা শুধু বেশি টাকায় থাকার জায়গারই সংস্থান করে না, খাবার, দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, যানবাহনের জন্যও কয়েক গুণ বেশি খরচ করতে বাধ্য হয়। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংকটে পড়তে হয়। খাগড়াছড়ির একজন যুবক বলেন,

> ঈদের সময় আর পুরো শীতকাল জুড়েই এ এলাকা মানুষে ভরে যায়। রিসোর্টে তিল ধারণের জায়গা থাকে না, খাবার হোটেলে লাইন ধরে থাকতে হয়, এমনকি চা খেতেও টং দোকানে অপেক্ষা করতে হয়। সবকিছুর দাম বেড়ে যায়। রিকশা মামারা অন্য সময় যাত্রী না পেয়ে ডাকাডাকি করে, কিন্তু এ সময়গুলোতে আমাদের পাত্তাই দেয় না। আমাদের

> কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেয়, কিন্তু খুব বেশি ভাড়া নিতে পারে না দেখে আমাদের ডাকে উত্তর দেয় না। আমাদের বাসা থেকে বের হওয়াই কষ্টকর হয়ে যায়। খাবারের দাম বেড়ে যায় বিধায় আমরা আগে থেকে বাজার করে রাখি। কিন্তু সবকিছু তো আর আগে থেকে রাখা যায় না। তাই অতিরিক্ত খরচ করতেই হয়। (রাঙামাটি শহর, ২ নভেম্বর, ২০২১)

আবার, ছুটিতে ঢাকা থেকে শিক্ষার্থীরা বা চাকরিজীবীরা নিজ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাড়ি যাবে, কিন্তু পর্যটকদের কারণে নানামুখী সমস্যা হয়। সে সময় সরকারি ছুটি থাকায় পর্যটকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। গাড়িতে টিকেট সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে যায়। পর্যটকদের চাহিদার কারণে গাড়ির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভাড়াও বাড়ছে। শুধু বড়ো ছুটি নয়, বর্তমানে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও পর্যটক বেড়ে যাওয়ার কারণে ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। নিজ এলাকায় যাওয়াও কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির টিকেট সংগ্রহ করতে শুধু উচ্চমূল্যই দিতে হয় না, পর্যটকদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদক্ষেপও অতিপর্যটন কার্যক্রম রোধ করতে পারছে না। পাহাড় কেটে সুইমিংপুল স্থাপন পাহাড়ের আকৃতি নষ্ট করে ফেলছে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাও রয়েছে যে, পাহাড় কেটে সুইমিংপুল স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু সেই নির্দেশনাও অমান্য করতে দেখা যায়।

২০২৩ সালের ঈদ-ই-মিলাদুন্নবিসহ শুক্র ও শনিবার মিলিয়ে টানা তিন দিনের ছুটিতে সাজেকে ইকো-ট্যুরিজম পর্যবেক্ষণে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে পর্যটক ধারণ ক্ষমতার কয়েকগুণ বেশি পর্যটক উপস্থিত হয়েছেন। একসঙ্গে তিনদিনের সরকারি ছুটি ঘিরে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে পর্যটকের উপচে-পড়া ভিড় দেখা গেছে। সাজেকের একজন রিসোর্ট ম্যানেজার সাক্ষাৎকারে বলেন, "আগে থেকেই এখানকার সব রিসোর্ট ও কটেজের কক্ষ বুকিং হয়ে যাওয়ায় গতকাল অনেকেই রাত কাটিয়েছেন স্থানীয়দের ঘরে অথবা রিসোর্ট-কটেজের স্টোর রুম, বারান্দা ও গাড়িতে। আবার অনেক পর্যটক রাত কাটিয়েছেন রাস্তায় ও খোলা আকাশের নিচে তাঁবু গেড়ে। ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পর্যটকের উপস্থিতির কারণে পর্যটক সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে আর পর্যটকরাও সন্তুষ্টি পাচ্ছে না। এই ছুটি ঘিরে তাদের অনেকেই দুই থেকে তিন মাস আগে সাজেকের রিসোর্ট ও কটেজে বুকিং দিয়ে রেখেছেন। সাজেকের রুইলুই পর্যটনকেন্দ্রে মোট ১১২টি রিসোর্ট ও কটেজ আছে, যেগুলোর ধারণক্ষমতা চার থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে চার হাজার পর্যটকের থাকার মতো। কিন্তু ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সাজেকে যাওয়া পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ হাজারে। ধারণক্ষমতার বেশি পর্যটক হওয়ায় তাদের রিসোর্ট বা কটেজে জায়গা দেওয়া যায়নি, যার ফলে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে কিছু পর্যটকদের। যারা আগে থেকে বুকিং দেন নি অথবা যোগাযোগ করে আসেনি তারা স্থানীয়দের সহায়তায় খুর কষ্ট করে রাত্রি যাপন করে (মাঠকর্ম: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)।

অতিপর্যটনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইকো-ট্যুরিজমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। অনেক কোম্পানি রয়েছে, যারা ইকো-ট্যুরিজম 'ব্যবসা' পরিচালনা করে সবচেয়ে বেশি অর্থ লাভ করে, কিন্তু স্থানীয়রা খুব কম অর্থ উপার্জন করে। স্থানীয় নিম্নবিত্ত শ্রেণির লোকেরা পর্যটন-ব্যবসায় বিনিয়োগে সামর্থ্য রাখে না, তাই কেউ মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে রিসোর্টে নিযুক্ত হয় অথবা কেউ রাস্তায়, পর্যটক আকর্ষণীয় স্থান যেখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি, সেখানে শুকনো খাবার, চা, বাদাম বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে। তবে স্থানীয় প্রভাবশালীরা, যারা বিনিয়োগে সামর্থ্য রাখে, তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তন ঘটায়। এ বিষয়টি 'বহিরাগত' ব্যবসায়ীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা বন ছোটো করে ইকো-ট্যুরিজমের নামে বাঁশ-কাঠে কৃত্রিম

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কেমিক্যাল রং ব্যবহার করে, কোথাও কংক্রিট, টাইলস বা ইট-সিমেন্ট ব্যবহার করে স্থাপনা তৈরি করছে, জলাধারের পাড়ে ইট-সিমেন্টের সিঁড়ি বানাচ্ছে, জেনারেটর ও এসি ব্যবহার করছে, তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায় শুধু ইকো-ট্যুরিজমের বৈশ্বিক নীতির অপব্যবহারই করছে না, প্রাকৃতিক সম্পদও বিনষ্ট করছে। আর এ জন্য যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রয়োজন, তা স্থানীয় এলিট বা 'বহিরাগত' ব্যবসায়ী ছাড়া সম্ভব নয়।

ভ্রমণপিপাসুদের অনিয়ন্ত্রিত আনাগোনা আর বনের গভীরতা কমে যাওয়ায় পার্বত্য বন ফাঁকা হয়ে আসছে। বাণিজ্যিকভাবে জেলায় অনেক হোটেল, মোটেল ও রিসোর্ট গড়ে উঠেছে। যদি এর সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ না করা হয়, তবে অচিরেই ধ্বংস হবে পর্যটনস্পটগুলো। বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবনও এ ইকো-রিসোর্টের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েনি। ২০১৮ সালে খুলনার দাকোপ ও বাগেরহাটের মোংলা এলাকায় সুন্দরবন ঘিরে ইকো কটেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩টি। ২০২১ সালেও তা একই ছিল। এরপর যেন রিসোর্ট নির্মাণের হিড়িক পড়ে। সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক সুন্দরবন ঘিরে কমিউনিটি-বেইজড ইকো-ট্যুরিজম নিয়ে গবেষণা করেছেন (*প্রথম আলো*, ০৩ জুন, ২০২৪)। গবেষণার তথ্য বলছে, দুই বছরের ব্যবধানে ২০২৩ সালে এসে রিসোর্টের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। ২০২৩ সালে ১২টি রিসোর্টের ৭৪টি কক্ষে পর্যটক থাকতে পারতেন ২৬০ জন। চলতি বছর আরও ৫৮ কক্ষবিশিষ্ট ৮টি কটেজ তৈরি হচ্ছে। সাতটি পুরোনো কটেজে নতুন ৪২টি কক্ষ তৈরির কাজ চলছে। সব মিলিয়ে ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ২০টি কটেজে পর্যটক ধারণক্ষমতা দাঁড়াবে ৫৬০ জনে।

ভাওয়াল, সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকা, এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছে যে, বনের অভ্যন্তরে চারিদিকে সুউচ্চ দেয়াল নির্মাণ করে ভবন, সুইমিংপুল, বাগান, পার্ক, খেলার জায়গা নির্মাণ মূলত ইকো-রিসোর্টের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষজ্ঞরা[৮] মনে করেন যে, ইকো-রিসোর্টের মালিকদের ব্যবস্থা, মুনাফা এখানে মুখ্য বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের ইকো-রিসোর্টের ধারণাই নেই। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটকদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। রিসোর্টের সঙ্গে যুক্ত সকলকে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে অবগত করা প্রয়োজন। ইকো-ট্যুরিজম সুবিধাগুলো বাস্তবায়নের জন্য কঠোর নীতি প্রণয়ন, সঠিক পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহারিক কৌশলগুলোর মূল্যায়ন অপরিহার্য।

কিছু সময় অতিপর্যটন পর্যটককে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পার্বত্য অঞ্চল এমনিতেই বর্ষাকালে অতিবর্ষণের ফলে পাহাড়ধসের মতো নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এসব পরিস্থিতিতে পর্যটনের জন্য কোনো বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয় না। বর্ষাকালে পর্যটনে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বা কীভাবে পর্যটন পরিচালিত হবে বা আদৌ ঝুঁকিমুক্ত পর্যটন পরিচালনা করা সম্ভব কি না—সে বিষয়ে কোনো আবহাওয়া ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞের সাথেও কোনো যোগাযোগ বা সম্পৃক্ততা চোখে পড়ে না। এমতাবস্থায় পর্যটক ভ্রমণে গিয়ে দুর্যোগের শিকার হন। ২০২৪ সালেও জুলাই মাসে এমন ঘটনা সাজেকে পরিলক্ষিত হয়। অতিবর্ষণে প্রায়ই পর্যটক সেখানে আটকা পড়ে।

অনেক সময় পর্যটকদেরও অতিপর্যটন থেকে আটকানো যায় না। কিছু বাণিজ্যিক হোটেল ও রিসোর্ট বর্ষাকালে তাদের প্রতিষ্ঠান খোলা রাখে এবং পর্যটক আকর্ষণের জন্য সে সময় ডিসকাউন্টেরও ব্যবস্থা করে, যা পর্যটকদের উৎসাহী করে এবং দুর্যোগের মুখোমুখি করে তোলে। ২০২৪-এর জুলাইয়ের ঘটনা তারই

[৮] বিস্তারিত দেখুন এখন টিভি প্রতিবেদন, ১৮ জানুয়রি ২০২৪ ''দেশে বাড়ছে ইকো নামধারী রিসোর্টের সংখ্যা"।

বহিঃপ্রকাশ। শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নয়, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনেও এ ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা। সেখানে বিপদসংকেত উপেক্ষা করেও ঝড়ের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি মেলে। দীর্ঘদিন যাবৎ কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে আটকে পড়ার ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অতিপর্যটন রোধে তার ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো ঘটনা মোটেও ঘটছে না।

কেইস কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ঘূর্ণিঝড়

বিশ্বের অনেক দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ভলান্টারি বা স্বেচ্ছাসেবী পর্যটনপ্রথা প্রচলিত রয়েছে। এ ধরনের পর্যটন মূলত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাস্থ্যগত চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করা, খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করাসহ নানাবিধ কাজে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, এমনকি বিদেশ থেকেও সাহায্য করতে আসে। ভলান্টারি ট্যুরিজম বা স্বেচ্ছাসেবী পর্যটন প্রত্যয়টি বিকল্প পর্যটনের একটি অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বিকাশ লাভ করলেও বা পরিচিতি পেলেও ত্রাণসরবরাহকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বহুকাল ধরে এ ধরনের কার্যক্রম প্রচলিত। ২০১২ সালে জাপানের ফুকোশিমায় সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এ ধরনের ভলান্টারি পর্যটন বা স্বেচ্ছাসেবী পর্যটন জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্যোগের সময়কালে, এমনকি দুর্যোগের সময় পর্যটকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ২৬ মে ২০২৪ সালে ঘূর্ণিঝড় 'রেমালে'র প্রভাবে সাগর উত্তাল হয় তখন দেশ-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সতর্কতা জারি করার সংবাদ প্রকাশ হলেও পর্যটকরা উপেক্ষা করে সমুদ্রে যায়। ২২ অক্টোবর ২০২৪ সালেও এ ধরনের ঘটনা দেখা গিয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সতর্কতা সংকেত উপেক্ষা করে সাগরে নেমে যায়। বিষয়গুলোকে অতিপর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সমুদ্রভ্রমণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সেখানে ভ্রমণ বা উল্লাসের মাধ্যমে সমুদ্রতীরে ঘূর্ণিঝড়ের কালো মেঘসহ ছবি বা সেলফি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার মোটেও ভলান্টারি পর্যটন নয়, তাকে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের মাধ্যমে অতিপর্যটনকে উৎসাহিত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

বিদেশি ভাষায় হোটেল রিসোর্টের নামকরণ ও স্থানীয় এলাকার নাম পরিবর্তন

পর্যটনকে কেন্দ্র করে যেসব রিসোর্ট গড়ে উঠছে, তার নামকরণের দিকে যদি লক্ষ করা যায়, সেখানকার বেশির ভাগ নামকরণ করা হয়েছে ওয়েস্টার্ন বা বাংলা নামে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা বা নামের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন—রাঙামাটিতে স্থাপিত লেকশোর রিসোর্ট, নীলাঞ্জনা রিসোর্ট, রাঙাদ্বীপ রিসোর্ট, গ্র্যান্ড হিল তাজ রিসোর্ট, ডিভাইন লেক আইল্যান্ড রিসোর্ট, লেক ভিউ আইল্যান্ড রিসোর্ট, স্কয়ার পার্ক, ক্রাউন প্লাজা ইত্যাদি নামে যেসব রিসোর্ট বা হোটেল গড়ে উঠেছে, সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, পশ্চিমা ইংরেজি নাম অথবা বাংলা নাম। সে নামগুলোর সঙ্গে স্থানীয় নাম, ইতিহাস, সংস্কৃতির কোনো যোগাযোগ নেই। এগুলো যদি স্থানীয় ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রেখে নামকরণ করা হতো, তা হলে নামের কারণেও পর্যটক এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতো। একই ঘটনা লক্ষ করা যায় খাবারের হোটেলের নামকরণের ক্ষেত্রে, যেমন—দরবার হোটেল এন্ড রেস্তোরাঁ, আল মদিনা বিরিয়ানি হাউজ, খাজা হোটেল এন্ড রেস্তোরাঁ, হোটেল সুফিয়া, রেড চিলি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি।

শুধু রিসোর্ট বা হোটেলের নামই নয়, পর্যটনখ্যাত এলাকার নামও পরিবর্তন করা শুরু হয়েছে। পার্বত্য জেলা বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও স্থানে এ ধরণের নাম পরিবর্তনের হার চোখে পড়ার মতো। বান্দরবান সদর উপজেলায় রয়েছে ডোলা ম্রো পাড়া, যার বর্তমান নাম হয়েছে জীবননগর, কাপ্রু পাড়ার কিছু অংশ পড়েছে নীলগিরিতে, চি ওয়াই জংশনকে নাম দেওয়া হয়েছে বারো মাইল ও নাইতং পাহাড় হয়েছে চিম্বুক পাহাড়। নান্যাচরের নামকরণ করা হয়েছে নানিয়াচর, পাগুজ্জেছড়ি হয়েছে পাকিজাছড়ি,

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বেতবন্যাকে বলা হচ্ছে বেতবুনিয়া, ক্যক্রুডং পাহাড়ের নাম হয়েছে কেওক্রাডং, টাইংছেই থেকে থানচি, বিখ্যাত পর্যটনস্থান ঙাফাখোং এখন নাফাখুম নামে সব ক্ষেত্রেই পরিচিত। একইভাবে রাখইংওয়া হয়েছে রোয়াংছড়ি, চ্যংবত হুম থেকে চিম্বুক, চিংম্রং থেকে চিৎমরম, সারবোতলী থেকে সারোয়াতলী, হুদুকছড়ি থেকে কুতুকছড়ি ইত্যাদি জায়গার নাম বিকৃত হয়ে যায়। খাগড়াছড়িতে মাজনপাড়ার নামকরণ করা হয়েছে মহাজন পাড়া, চিলা-প্রু চৌধুরি টিলার নামকরণ করা হয়েছে শালবাগান বা শালবন—এ রকম কিছু কিছু জায়গার পুরো নামই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। যেমন—পানছড়ি উপজেলার চাইতঙ চৌধুরী আদাম পরিবর্তন করে পোড়াবাড়ি, চেমবা মাজনপাড়া পরিবর্তন করে হাসান নগর, আচায় মাজনপাড়া পরিবর্তন করে কলাবাগান ইত্যাদি। আবার বন কেটে বাসস্থান বা রিসোর্ট তৈরি করার আগে সে এলাকাগুলোর বাংলা নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—পলাশপুর, পলাশনগর, মধ্যপাড়া, বড়পাড়া ইত্যাদি (পার্থ, ২০২১, নাসরীন, ২০০২)। পর্যটনের পাশাপাশি বাঙালি সেটেলার কার্যক্রম নাম পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ ঘটনা তিন পার্বত্য জেলার খুব সাধারণ চিত্র, যাকে অনেক গবেষক আদিবাসীদের উপর অধিপতিশীলদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করেন (পার্থ, ২০২১; নাসরীন, ২০০২)। কিন্তু স্থানীয় এলাকার নতুন নামকরণের বিষয়টি ইকো-ট্যুরিজম ধারণার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক, যা পর্যটকদের স্থানিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার পথকেও বন্ধ করে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'চিংড়ি' খাল একটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থান। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে, 'চিংড়ি খাল' নামে কোনো খাল নেই। এটি হবে, 'চেংগী' বা চেঙ্গী নদী। রাঙামাটি জেলার বুড়িঘাটে চেঙ্গী নদীর পারে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের সমাধি রয়েছে, শত শত পর্যটক প্রতিদিন সেটি দেখতে আসেন।[৯] শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, যে-কোনো স্থানের নামের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সামাজিক অর্থ সংযুক্ত থাকে। মধুপুর ভাওয়ালের গড়ে শান্তিনিকেতন নামের কটেজ বা রসুলপুর নামে এলাকার নাম দেওয়া গারোদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নয়। একইভাবে গাজীপুরের ভাওয়ালের গড়ের নূহাস পল্লীকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজার বা সাফারি পার্ককে কেন্দ্র করে বাঘবাজার নামে বাজার প্রতিষ্ঠা করা স্থানিক নামকরণের গুরুত্বকে হ্রাস করে। গাজীপুর, মধুপুর বা পার্বত্য চট্টগ্রামের বন—সেটা যেখানেই হোক না কেন, সেখানে সামাজিক বনায়ন হচ্ছে, রিসোর্ট প্রতিষ্ঠাতেও নতুন করে সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে, যেগুলো প্রাকৃতিক বা স্থানিক প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে হচ্ছে না। এগুলো স্থানিক ইতিহাসকে পরিবর্তিত করে এবং পর্যটকও নতুন বিষয়গুলোকেই জানতে শুরু করে, প্রাচীন ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক বা পর্যটনের কারণে যদি হঠাৎ করে সে নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তা হলে সেটা এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। পর্যটনকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশেই তা ঘটছে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও সে ঘটনাই ঘটছে।

ইকো-ট্যুরিজম কি 'অরাজনৈতিক'?

ইকো-ট্যুরিজম নিওলিবারেল নীতিমালার মধ্যে পণ্যবিন্যাস, খরচ ও সুবিধা বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু এটি পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবেশনের কথা বলে, তাই এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ বা সমালোচনা করা কঠিন করে তোলে। বরং এটি 'স্থানীয় সম্প্রদায়, বৈশ্বিক এনজিও, দাতা ও IFIs-সহ জটিল পরিসরের স্বার্থ-গোষ্ঠীর কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থন পায়' (ডাফি, ২০০৯: ৩৪১)।

---

[৯] দেখুন, "ভাষার আধিপত্য: পার্বত্য চট্টগ্রামে আদি নামের বিকৃতকরণ কেন", ইলিরা দেওয়ান, *প্রথম আলো*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। প্রথম আলোর রিপোর্ট " সুন্দরবন ঘিওে একের পর এক রিসোর্ট, চলছে এসি-জেনারেটর। শুধু পর্যটনকে কেন্দ্র করে এলাকার নতুন নামকরণ হয়নি। স্থানীয় এলাকার নামকরণের বড় কারণ হচ্ছে বাঙালী সেটলারদের পার্বত্য অঞ্চলে পূনর্বাসন। তরে পর্যটকদের আকর্ষিত করতেও পর্যটন এলাকার পূনরায় নামকরণ করা হয়েছে।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এ ঘটনা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অহরহ ঘটছে, অর্থাৎ ইকো-ট্যুরিজম নাম দিয়ে খাল ও নদী ভরাট এবং ন্যাচারাল পার্ক স্থাপন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এ বিষয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সমরূপ খবর প্রকাশিত করছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রশাসন, বহুজাতিক কোম্পানিসহ ক্ষমতাশালী স্টেকহোল্ডারদের যুক্ততাও খুঁজে বের করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড ইকো-ট্যুরিজমের নাম করে মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ। কেননা ইকো-ট্যুরিজমের নাম করে প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিলে স্থানীয় সম্প্রদায়, বৈশ্বিক এনজিও, দাতাসহ জটিল পরিসরের স্বার্থ-গোষ্ঠীর কাছ থেকে বৈধতা পায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'দিগন্তজোড়া জমির মিথ'[১০] ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করছে সেখানকার জমিতে স্থাপনা তৈরি করতে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ইকো-ট্যুরিজমে রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রভাব ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। রোহিঙ্গারা যে স্থানে আশ্রিত হয়েছে, তা শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীবিখ্যাত সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নিকটবর্তী এলাকা, বান্দরবানের পার্শ্ববর্তী জেলা। রোহিঙ্গাদের শরণার্থীক্যাম্পগুলো যে এলাকায় স্থাপিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত। শুধু বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতই নয়, পাহাড়, বন ও নাফ নদীসহ ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কক্সবাজার। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালেও যখন রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে থাকে, তাদের বসবাসের ফলস্বরূপ যে বাংলাদেশ পরিবেশগত ঝুঁকিতে পড়বে, সে বিষয়টি তেমন বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এটি দৃশ্যমান যে, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বন মন্ত্রণালয় প্রায় ৮,০০০ একর জমি শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ করে)। বাস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়ে বন-উজাড়, ক্ষয় ও প্রাণীদের (এ ক্ষেত্রে হাতি) যাত্রাপথের বিনষ্টকরণ এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের পুনর্গঠনকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত শরণার্থীরা অবস্থান করছে, পরিবেশের এসব নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর উপায় নেই। কারণ জ্বালানিকাঠ শরণার্থীশিবিরের জ্বালানি ও শক্তির জন্য সাধারণত সবচেয়ে সুলভ হওয়ার পাশাপাশি প্রধানতম নিরাপদ কাঁচামালও। কিন্তু ২০২০-পরবর্তী সময়ে মানবিক ত্রাণকার্যের পাশাপাশি পরিবেশগত চিন্তাও

[১০] আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা ঘনত্ব কম থাকার কারণে মনে করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক ফাঁকা জমি রয়েছে, যেখানে চাইলেই সমতল থেকে গিয়ে মানুষ বসতি স্থাপন করতে পারবে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিনোদনের উদ্দেশ্যে পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে, রিসোর্ট তৈরি করতে পারবে, মেডিটেশন সেন্টার তৈরি করতে পারবে বনাঞ্চল পরিষ্কার করে সেই জায়গা সমতলের মানুষ কর্তৃক লিজ নিয়ে চাষাবাদ করতে পারবে অথবা অফিস সেনানিবাস বা তাদের ট্রেনিং সেন্টার যেকোনো কিছু স্থাপন করা মত অনেক ফাঁকা জায়গা বিদ্যমান । কিন্তু প্রাণ বৈচিত্র রক্ষার জন্য যে প্রকৃতি বনাঞ্চল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় না। তাই এ ধরনের ফাঁকা জায়গা কেন্দ্রীক ডিসকোর্স কে অনেকেই "দিগন্তজোড়া জমির মিথ" হিসাবে আখ্যায়িত করেন। বাংলাদেশের আয়তন ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার, পার্বত্য তিন জেলার মোট আয়তন প্রায় ১৩১৯১ বর্গ কিলোমিটার, যা দেশের মোট আয়তনের ১১.১৯ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের মোট জনসংখ্যা যেখানে ১৬৫১৫৮৬১৬ জন, সেখানে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস করেন ১৮৪২৮১৫ জন, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৬ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের ১১.১৯ শতাংশ আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করেন মোট জনসংখ্যার ১.১৬ শতাংশ মানুষ। প্রাণ-প্রকৃতি সংরক্ষণ এই অঞ্চলের জন্য বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হলেও সমতলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার 'চাপ কমাতে' এখানে ভূমিহীনদের পূনর্বাসন, সরকারী বেসরকারী ট্রেনিং সেন্টার, মেডিটেশন সেন্টার, জমি লিজ চাষাবাদ সহ নানাভাবে পাহাড়ের জমিকে সংকুচিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে " দিগন্তজোড়া জমির মিথ " হিসেবে ডিসকোর্স ব্যবহার করা হচ্ছে যে এখানে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমান অনেক বেশি। এই ডিসকোর্সেরই সাম্প্রতিক দশকের সংযোজন ইকো ট্যুরিজম, কটেজ, হিল টুরিজম বা ফ্যান্টাসি পার্কের নামে জমির ব্যবহার - যা কখনো 'পরিকল্পিত' আবার 'অপরিকল্পিত'। " দিগন্তজোড়া জমির মিথ " এর গল্প প্রাণ-প্রকৃতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতাকেও অনেকাংশে পুনরূতপাদিত করে (হুসেইন, ২০২৪; পার্থ, ২০২৪)।

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। সমুদ্রের পাশে বন কেটে ক্যাম্প নির্মাণ, বনের কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, যা ইকো-ট্যুরিজমকেও প্রভাবিত করছে (হুসেইন, ২০২৪)।

তবে কক্সবাজারের পরিবেশ-বিপর্যয়ে শুধু রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দায়ী করার বিষয়টি একভাবে 'ভিক্টিম ব্লেমিং'-এর পর্যায়ে পড়ে। পরিবেশ-বিপর্যয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দায় রয়েছে—এ কথা সত্যি, কিন্তু কক্সবাজারের পর্যটনকে কেন্দ্র করে ভূমির ব্যবহার, গাছকাটা, পাহাড়কাটার মতো বিষয়গুলো শরণার্থী 'ভিক্টিম ব্লেমিং'-এর মধ্য দিয়ে আড়াল হয়ে যায়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, মেডিটেশন সেন্টার, ফ্যান্টাসি পার্ক, রিট্রিট সেন্টার, অনাথাশ্রম বা এতিমখানা, বয়স্কদের পুনর্বাসনকেন্দ্রের মতো নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামে। 'দিগন্তজোড়া' জমির মিথ এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে জমিতে, পাহাড়ে ও বনভূমিতে স্থাপনা তৈরি করতে। রোহিঙ্গা শরণার্থী কর্তৃক ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশ-বিপর্যয়ের অপরাপর কারণগুলোকে (ইকো-ট্যুরিজমের নামে স্থাপনা নির্মাণ, সুইমিং পুল নির্মাণ, ফ্যান্টাসি পার্ক, রিট্রিট সেন্টার ইত্যাদি) আড়াল করে।

উপসংহার

ইকো-ট্যুরিজম ধারণা হতে আমরা জানতে পারি যে, পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে শুধু মুনাফা অর্জনই নয় — স্থানীয় জনগণ, প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপিপাসু, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার সংগঠন ও স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণের একটি সমন্বিত রূপই হচ্ছে ইকো-ট্যুরিজম। কিন্তু ইকো-ট্যুরিজমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন এথনোগ্রফিক উদাহরণের মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজমের ডিসকোর্স ও চর্চার ক্ষেত্রে অন্তত তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে:

প্রথমত: অনেকক্ষেত্রে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিচালিত ইকো-ট্যুরিজম 'ব্যবসা'য় স্থানীয়দের অংশগ্রহণ সীমিত থাকে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়। স্থানীয় নিম্নবিত্ত শ্রেণির লোকেরা পর্যটন-ব্যবসায় বিনিয়োগে সামর্থ্য রাখে না, তাই কেউ মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে রিসোর্টে নিযুক্ত হয়। ইকো-ট্যুরিজমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী 'এক্টিভ এজেন্ট' নয়, বরং 'প্যাসিভ রেসিপিয়েন্ট' হিসেবে আবির্ভূত করে। আর মোট কথা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেহেতু শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গীয় দিক থেকে সমরূপ নয়, তাই ইকো-ট্যুরিজমে সবার অংশগ্রহণের মাত্রাও সমান নয়। ইকো-ট্যুরিজম নিওলিবারেল নীতিমালার মধ্যে পণ্যবিন্যাস, খরচ ও সুবিধা বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু এটি পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবেশনের কথা বলে, তাই এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করাও কঠিন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: অতিপর্যটনের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে স্থানীয় সমাজ ও পরিবেশের উপর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইকো-ট্যুরিজম পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বললেও তা একভাবে অতিপর্যটনকেই উৎসাহিত করছে। ইকো-ট্যুরিজমের নামে 'অতি পর্যটন' স্থানীয় সমাজে পর্যটনের বিরূপ প্রভাব ফেলে। পর্যটন মৌসুমে রিসোর্ট বা হোটেলে ধারণক্ষমতা থাকে না। খাবার চাহিদাও বেড়ে যায়। অতিরিক্ত পর্যটক আগমনের ফলে দ্রব্যের জোগানের তুলনায় চাহিদা বহু গুণ বেড়ে যায়। স্থানীয় বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। পর্যটকরা শুধু বেশি টাকায় থাকার জায়গারই সংস্থান করে না, খাবার, দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, যানবাহনের জন্যও কয়েক গুণ বেশি খরচ করতে বাধ্য হয়। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীরও সংকটে পড়তে হয়।

তৃতীয়তঃ যে-কোনো স্থানের নামের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সামাজিক অর্থ সংযুক্ত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন রিসোর্টের নামকরণ স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করেনা। যা স্থানিক নামকরণের গুরুত্বকে হ্রাস করে। গাজীপুর, মধুপুর বা পার্বত্য চট্টগ্রামের বন—সেটা যেখানেই হোক না কেন, সেখানে সামাজিক বনায়ন হচ্ছে, রিসোর্ট প্রতিষ্ঠাতেও নতুন করে সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে, যেগুলো প্রাকৃতিক বা স্থানিক প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে হচ্ছে না। এগুলো স্থানিক ইতিহাসকে পরিবর্তিত করে এবং পর্যটকও নতুন বিষয়গুলোকেই জানতে শুরু করে, প্রাচীন ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক বা পর্যটনের কারণে যদি হঠাৎ করে সে নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তা হলে সে এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। ইকো-ট্যুরিজমে সাধারণত ভ্রমণকারীকে এলাকা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কিত ও অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে, বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণকে এখন ইকো-ট্যুরিজম হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হচ্ছে। এগুলোর বেশির ভাগই প্রকৃতপক্ষে ইকো-ট্যুরিজম নয়। কারণ তারা পরিদর্শন করা স্থানগুলোতে সংরক্ষণ, শিক্ষা, কম প্রভাব ভ্রমণ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের উপর জোর দেয় না। স্থানীয় রাজনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক জলবায়ু সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইকো-ট্যুরিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

তথ্যসূত্রঃ

Agrawal, A. (2005). Environmentality: Community, Intimate Government, and the Making of Environmental Subjects in Kumaon, India. *Current Anthropology*, 46(2), pp. 161–190.

Belsky, J. (1999). Misrepresenting Communities: The Politics of Community-Based Rural Ecotourism in Gales Point Manatee, Belize. *Rural Sociology*, 64(4), pp. 641–666.

Boorstin, D. J. (1961). The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Harper and Row.

Carrier, J. G., & Macleod, D. V. L. (2005). Bursting the Bubble: The Socio-Cultural Context of Ecotourism. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 11, pp. 315–334.

Ceballos-Lascuráin, H. (1996). Tourism, Ecotourism and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism around the World and Guidelines for Its Development. IUCN Publications, Cambridge, 301. http://dx.doi.org/10.2305/iucn.ch.1996.7.en

Dalglish, C. (2018). Is ecotourism a 'magic bullet' for sustainable development? — An anthropological essay, Published in Environmental Ideas. https://medium.com/environmental-intelligence/is-ecotourism-a-magic-bullet-for-sustainable-development-an-anthropological-essay-c60c1062aaff

Das, M., & Chatterjee, B. (2015). Ecotourism: A panacea or a predicament? *Tourism Management Perspectives*, 14, pp. 3–16.

Duffy, R. (2002). A Trip Too Far Ecotourism, Politics and Exploitation, Routledge.

Duffy, R. (2009). Neoliberalising Nature: Global Networks and Ecotourism Development in Madagascar. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(3), pp. 327–344.

Ecotourism Society, The 1991. Ecotourism guidelines for nature-based tour operators. Vermont, USA

Escobar, A. (1999). After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology. *Current Anthropology*, 40(1), pp.1–30.

Ferguson, J., & Gupta, A. (2002). Spatializing states: toward an ethnography of neoliberal governmentality. *American Ethnologist*, 29(4), pp. 981–1002.

Fletcher, R. (2010). Neoliberal environmentality: Towards a poststructuralist political ecology of the conservation debate. *Conservation and Society*, 8(3), pp. 171–181.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Fletcher, R. (2013). Bodies Do Matter: The Peculiar Persistence of Neoliberalism in Environmental Governance. *Human Geography*, 6(1), pp. 29–45.

Fletcher, R. (2018). Ecotourism after nature: Anthropocene tourism as a new capitalist "fix", Journal of Sustainable Tourism 27(7):1-14, DOI:10.1080/09669582.2018.1471084

Foucault, M. (1991). Governmentality. In: G. Burchell, C. Gordon, and P. Miller, eds., 1991. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press. pp. 87–104

Gray, N. J., & Campbell, L. M. (2007). A Decommodified Experience? Exploring Aesthetic, Economic and Ethical Values for Volunteer Ecotourism in Costa Rica. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(5), pp. 463–482.

Kathleen, M. (1999). Selling Nature to Save It? Biodiversity and Green Developmentalism, Environment and Planning D Society and Space 17(2):133-154, DOI: 10.1068/d170133

Marcus, G. A. (1995), Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, *Annual Review of Anthropology*, vol. 24.

Nasreen, Z, & Togawa, M. (2002) Politics of Development: 'Pahari-Bengali'Discourse in the Chittagong Hill Tracts Journal of International Development and Cooperation 9 (1), 97-112, 2002

Stronza, A. (2001). Anthropology of tourism: forging new ground for ecotourism and other alternatives. Annual Review of Anthropology 30:261-283

Youdelis, M. (2013). The competitive (dis)advantages of ecotourism in Northern Thailand, Geoforum 50:161–171, DOI: 10.1016/j.geoforum.2013.09.007

Young, E. (1999). Balancing Conservation with Development in Small-Scale Fisheries: Is Ecotourism an Empty Promise? *Human Ecology*, 27(4), pp. 581–620.

হুসেইন, ইমতিয়াজ এ. (২০২৪) বাংলাদেশ, শরণার্থী আন্তপ্রবাহ এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাবঃ এক 'মাতৃকা' থেকে আরেকটিতে,রঞ্জন সাহা পার্থ, ওবায়দুল্লাহ আল মারজুক ও মাসাহিকো তোগাওয়া সম্পাদিত শরনার্থীর সঙ্গে বসবাস: রোহিঙ্গা ও স্থানীয় বাঙালির প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

পার্থ, রঞ্জন সাহা (২০২৪) ভূমিকা, রঞ্জন সাহা পার্থ, ওবায়দুল্লাহ আল মারজুক ও মাসাহিকো তোগাওয়া সম্পাদিত শরনার্থীর সঙ্গে বসবাস: রোহিঙ্গা ও স্থানীয় বাঙালির প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Newspaper sources

দেশে বাড়ছে ইকো নামধারী রিসোর্টের সংখ্যা (2024, June 18). এখন টিভি. https://ekhon.tv/article/66710938cc1ad96ce5d8f945

Promoting ecotourism to secure tourist hotspots. (n.d.). The Financial Express. Retrieved March 24, 2025, from https://thefinancialexpress.com.bd/views/columns/promoting-ecotourism-to-secure-tourist-hotspots-1533053480

সুন্দরবন ঘিরে একের পর এক রিসোর্ট, চলছে এসি-জেনারেটর. Prothomalo. Retrieved March 24, 2025, from https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g3zj6puopj

সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, বিস্তারিত দেখুন https://thefinancialexpress.com.bd/views/columns/promoting-ecotourism-to-secure-tourist-hotspots-1533053480

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Culture to Commodity: Exploring the Intersection of Tourism, Consumerism of Culture and Media in the Sajek Valley

Md. Rahmat Ullah[1] and Maliha Tasnim[2]

Abstract:
This study investigates the transformation of a culture into a commodity through tourism, focusing on the commodification process within the indigenous culture of Ruiluipara, situated in the Sajek union of Baghaichhari upazila in the Rangamati district of Bangladesh. The research explores the contributions of various entities, including tourists and the local community, involved in the tourism industry to this process, specifically emphasizing the role of media and modern technology. Employing a qualitative approach, the study aims to achieve its objectives, by gathering data from both primary and secondary sources. In the intricate process of transforming culture into a commodity, multiple stakeholders, each playing a distinct role, contribute to the evolving dynamics in the Sajek Valley. Tourists, positioned as consumers, actively partake in this cultural exchange, immersing themselves in the market created by the indigenous people. In this marketplace, the local indigenous communities assume the role of sellers, presenting their culture as a marketable product. This transformative journey, catalyzed by tourism, unfolds against the backdrop of dynamic contributions from various entities, especially social media. Media, a powerful influencer in contemporary society, assumes a pivotal role in sparking interest and catalyzing the exchange between buyers (tourists) and sellers (indigenous people). Through various channels, media serves as a bridge, bringing these two distinct entities onto a common platform—the cultural marketplace. This confluence of media and tourism lays the foundation for the commodification of culture, creating a dynamic marketplace where the indigenous culture transforms into a valuable commodity.

1. Introduction

As we journey further into the modern age in the 21st century, activities once considered pastimes have now fallen prey to capitalism and metamorphosed into industries, and tourism is a noteworthy mention among them. But at its core, tourism remains the practice of traveling for pleasure or leisure to explore new destinations, cultures, and experiences. According to the Tourism

[1] Lecturer, Department of Anthropology, Shaikh Burhanuddin Post Graduate Collge, Dhaka-1100, Orcid ID: https://orcid.org/0009-0000-1803-3992
Email: rahmat.du156@gmail.com

[2] Independent Researcher, Orcid ID: https://orcid.org/0009-0005-7835-7389 Email: malihatasnim@ymail.com

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Association of England, "tourism is a type of short-term movement of a temporary person to a particular place, which is his own residence, or activity outside of the activity" (Beaver, 2002:313). Pearce (1982) defines tourism as "an industry whose origin or emergence is due to the increase in the movement of people and location in other addresses outside the home."

According to the World Tourism Organization, the number of international tourists worldwide exceeded 100 million in December 2012. In 2019, this number reached 1.5 billion ("UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2020," 2020). The tourism sector is thus gaining prominence in Bangladesh and growing rapidly, contributing to 3.02% of the total GDP as of 2019 (Hasan, 2021).

There are many tourist attractions in Bangladesh that national and international tourists can visit and experience. But in the age of mass tourism, the world has become a playground for avid explorers seeking unique cultural encounters. Chittagong Hill Tracts is one of the most desired destinations for tourists, and a prime reason for that, apart from its unique terrain, fauna, and flora, is the presence of the indigenous population residing there and therefore presenting the unique opportunity to get a taste of that distinctive culture. As tourism has flourished in this region, new variables have been introduced to the once-traditional way of life of these indigenous people and have brought about changes to their culture. The very act of exploring and appreciating diverse cultures can inadvertently contribute to their transformation into consumable products. In this article, we will explore the commodification of indigenous culture through tourism and take an in-depth look into the contribution of media to this narrative.

2. Tourism in Chittagong Hill Tracts: Historic Overview

Ever since mankind began to have surpluses of property, they were introduced to the world of leisure. The human race then began to wander around the world to discover the unknown. The wealthy often travel to distant destinations, where they get the opportunity to taste new cuisines, see infrastructural and architectural marvels, experience grand artworks, learn new languages, and immerse themselves momentarily in new cultures (Howlader, 2017). However, the concept of tourism came about much later.

Tourism emerged as an industry when people started seeing it as a source of income rather than mere leisurely entertainment. Eventually, new professions and classes emerged centered around tourism; some were buyers, some were

sellers, and some were just consumers; a new economy was built surrounding this sector. This became much broader and formalized after the formation of the World Tourism Organization (UNWTO).

The term 'tourist' was first used in 1772 and the term tourism in 1811. The United Nations used the term 'tourism' in 1939. After the unanimous agreement of the international community, due to the initiative of the United Nations, the World Tourism Organization (UNWTO) was formed in 1975. Today, tourism is one of the top five important products of about 83% of the countries in the world and the main foreign exchange earning product of 38% of the countries (Howlader, 2017).

Tourism occupies an important place in Bangladesh as well. According to the Report of the World Travel and Tourism Council, in 2013, the travel and tourism sector of Bangladesh directly created employment opportunities for a total of 1.282 million people. But that number stands at 2.175 million if we consider the employment created by the various affiliations involving the sector (Akhtaruzzaman, 2015).

Chittagong Hill Tracts house some of the most well-known and popular tourist spots in Bangladesh (TBS Report, 2020). The story begins during the British colonial period and with the invention of photography. Back then, there was no formal arrangement for tourism in the Chittagong Hill Tracts. But during that time in history, photography was invented. Europeans and members of the ruling class residing in India mostly pursued photography at the time. Through their photography, they attempted to showcase the lifestyle of the people living in the Hill Tracts. Therefore, in order to do so, the ruling class or the social elite had to travel to the hills on their own accord (Schendel, 2002).

It was during the erstwhile Pakistani rule that the official journey of tourism in the Chittagong Hill Tracts began. Schendel et al. (2001) stated that when the Pakistani rulers took up development projects in the Chittagong Hill Tracts, one of their key agendas was tourism. As a result, they shifted their focus to the natural beauty, people, and unchanged culture of the region. In 1960, with this aim in mind, they released a leaflet where they portrayed the hill people as 'peace-loving', 'friendly', 'helpful', and 'cheerful' who warmly invite the visitors to their ceremonies. All this contributed significantly to the development of tourism there. Another crucial mention is Kaptai Lake, which was declared a national asset in 1967. It was advertised through various means as a 'peaceful leisure-entertainment center.' And through these various campaigns, the

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

journey of tourism started in the Chittagong Hill Tracts during the Pakistani period. But mainly after 1997, the journey of tourism in the Chittagong Hill Tracts started on a larger scale through government and private initiatives (Lenin, 1998).

Post-1997, many spots emerged as tourist destinations and Sajek Valley is one of them. Sajek Valley is located in the Sajek Union of Baghaichhari Upazila of Rangamati. But it did not come into prominence until 2013–14. Since 2013, Sajek has become the most popular destination for city-centric and young tourists. In 2014, two luxury resorts were built at Ruiluipara in Sajek under the supervision of the Bangladesh Army. The army compares Sajek to Switzerland in Bangladesh. The media presents Sajek as "more beautiful than Darjeeling in India" (Ahmed, 2017). After the construction of paved roads from Khagrachhari's Baghaihat to Sajek, transportation has become much easier. Sajek has currently been transformed into one of the most beautiful tourist attractions in Bangladesh.

3. Tourism, Culture, Community and Commodification

Karl Marx's concept of commodity fetishism, introduced in Capital (1959), explains how market economies obscure the social relationships behind the production of goods. Instead of recognizing the labor involved, people focus solely on the commodity's price, giving it an almost mystical value. This results in a materialistic outlook where objects become more important than the human labor and relations that create them. Building on this, consumer fetishism, a concept introduced by Arjun Appadurai (1990), shows how media and advertising transform individuals into consumers. Media plays a pivotal role in shaping consumer identities, distorting the true nature of products, and creating an illusion of value. Through this process, commodities flow into everyday life, driving consumption while hiding the deeper reality of how these goods are produced.

Expanding on the theme of commodification, Theodor Adorno and Max Horkheimer (1972), in their critique of the culture industry, argue that entertainment and media industries manufacture cultural products solely for profit. Instead of fostering creativity or critical thought, art is commercialized to meet market demands. In this system, artistic expression is reduced to commercial products, stripping them of their original meaning. The culture industry, they argue, perpetuates capitalism by manufacturing passive consumers, limiting independent thinking and creativity. As a result, art and culture are commodified, reinforcing the dominant economic system.

J. Linnekin (1997) examines state-supported tourism's impact on cultural identity in Pacific societies, highlighting how culture and ethnicity are commodified in the tourism market. He argues that local culture becomes a commodity sold to tourists, and this process influences how cultural identity is constructed. Hawaiian culture, for example, is romanticized by tourists and marketed by travel companies. K. O'Gorman and K. Thompson (2007) analyze the experiences of Mongolian and foreign tourists at the Nadam festival, pointing out the challenges in balancing traditional cultural practices with modern tourism. While they explore cultural and behavioral differences, they do not address the commercial implications of tourism or its effect on local livelihoods. Harold Goodwin (2007) defines indigenous tourism as the direct involvement of indigenous peoples, with a focus on pro-poor tourism, highlighting how tourism alleviates poverty in small communities.

Shifting our lens onto Bangladesh's journey into tourism focusing on CHT, W. V. Schendel, W. Mey, and A. K. Dewan (2001) describe in their book, "The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland," the introduction of tourism in the CHT by Pakistani rulers under the guise of development. S.C. Roy and M. Roy (2015) discuss Bangladesh's potential as a future top travel destination. They address the concept and benefits of tourism but do not examine the impacts on indigenous cultures or how tourism affects local livelihoods. H.S. Ahmed (2017) explores how the government of Bangladesh uses military-controlled tourism to dominate the indigenous Jumma people in the Chittagong Hill Tracts (CHT), highlighting parallels between colonialism and present military rule. Ahmed shows how tourism has been used as a tool for legitimizing military control, where both the military and Bengali elites participate in exploiting the region. While tracing the history of colonization and its legacy, she highlights the continued marginalization and exploitation of indigenous peoples through tourism.

Recent works like those of S. Ahmed et al. (2023) and Roy and Sharmin (2021) focus on the socio-economic benefits of tourism in Sajek Valley, particularly the modernization and diversification of livelihoods for ethnic communities. However, they do not fully address how tourism affects indigenous culture and lifestyle, nor do they explore the negative impacts such as cultural commodification. Their research does not delve into the processes of commodification or cultural transformation. Al Sajib and Sohad (2021) discuss the commodification of indigenous culture in the CHT for financial gain, arguing that state policies for tourism development often prioritize economic growth at the expense of cultural integrity. While they acknowledge

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

the tourism industry's failure to address qualitative challenges, they do not explore the deeper cultural changes or the impact on ethnic livelihoods.

4. Objective of the study

The development of Sajek as an established and highly popular tourist spot is fairly recent; a new tourism-centric economy has developed in which the local community, tourists, and people of different occupations in the area are a part. All this makes Sajek a suitable candidate for research. This research, therefore, aims to examine how tourism transformed a culture into a commodity, specifically the process of commodification of the indigenous culture of the region called Ruiluipara, located in the Sajek union of Baghaichhari upazila of Rangamati district of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and how the various parties (including tourists and the local community) involved in the tourism industry contribute to this process, specifically via the role of media alongside modern technology.

5. Methodology

To conduct this study, a qualitative research approach has been used for collecting data, information, and analysis. Ethnographic interviews, FGD, and case study methods have been used. Random sampling has been used to select the informants. Sajek Valley, a famous tourist attraction of Sajek Union of Baghaichhari Upazila of Rangamati district was chosen for the research. Sajek Valley is mainly composed of Ruiluipara and Kanglak Para. The research work has been confined to Ruiluipara.

There are quite a few reasons for choosing the Sajek Valley as the research area of the study. First of all, Sajek Valley's journey as a tourist destination dates back to 2013-2014. It was not previously known as a tourist destination. This shows that a new tourism-based economy has developed there; as the local populace participate in it, it creates a hub for tourists and people of different professions.

Secondly, in the last few years, the Sajek area has become quite well known which has inspired the researcher to work there because this factor has played an important role in seeing the commodification process of indigenous culture of this large-scale tourism on the previously unnoticed culture of the local population living in the Sajek Valley. This is mainly why the Sajek Valley presented itself as a suitable candidate for the research work to be carried out.
Respondents were selected randomly for sampling; when the researcher went to the field site, he observed and interviewed the informants randomly,

including indigenous people, tourists, and businessmen related to tourism from Sajek Valley. A total of 33 informants were chosen.

This study collected data from two sources: 1. primary source, 2. secondary sources. The primary data was collected through fieldwork. The informants were Indigenous people, tourists, and various parties related to tourism from whom information and data have been collected directly. Secondary data has been collected from various books, periodicals, articles, essays, the internet, etc. related to tourism, indigenous people, and culture.
Some tools and techniques have to be used for conducting research as well as collecting information and data for the research with the ultimate goal of extraction and discovery of fruitful information. The techniques followed for collecting data for this research included:

- Ethnographic Interview
- Focus Group Discussion (FGD)
- Case study
- Photography and audio-visual recording
- Note-taking and diary writing

Ethical Consideration: The researcher took permission from all of the informants to record their words and also maintain the privacy of all of the informants for using the data. Alternative names have been used in the cases to hide their identity.

6. Major findings and discussion

Commodification refers to turning something into a product; that something could be an object, a thought, or a culture. Anything becomes a product when it becomes exchangeable for money (Dragstedt, 1976). The culture of the indigenous people of Sajek no longer solely belongs to the local community; rather, it has been subjected to consumerism. Tourism is the driver behind this transformation, making the tourists who come to visit Sajek the consumers.

Media, the plural form of the word- medium, in a broad sense, refers to the various means of communication that disseminate information, entertainment, or messages to a large audience. In the context of the question about the role of media in the commodification of indigenous culture through tourism, media plays a crucial role by shaping public perceptions, attitudes, and narratives. A tourist attraction only becomes an ‘attraction’ when it gains popularity through

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

various media by becoming known to people who are also potential tourists. Eventually, this leads to a flow of tourists to that area. Sajek is also one such place that has risen to fame thanks to the media.

The findings shed light on the intricate interplay of the various stakeholders involved in tourism, emphasizing how the portrayal and promotion of indigenous cultures via media contribute to commodification. As we delve into the subsequent discussion, an in-depth examination awaits to unravel the multifaceted dynamics at play, providing a nuanced understanding of the symbiotic relationship between tourism and the commodification of indigenous cultural heritage.

6.1 Tourism in the Eyes of the Media

Media refers to various channels of communication, but it can be broadly divided into three types, which we will use to further discuss the relationship between Sajek and media: print, broadcast, and social media.

Sajek in Print Media

A large part of the print media consists of daily newspapers. A close inspection of the various news reports about Sajek gives an idea about the portrayal of Sajek in the media. After collecting data from various popular news dailies, e.g: Prothom Alo[3], Daily Star[4], bdnews24.com[5], etc., the portrayal of Sajek as a kingdom of clouds, a country of clouds, the Darjeeling of Bangladesh, can be seen. These reports go so far as to promote the fascinating idea that not visiting an epitome of natural beauty like Sajek is equivalent to living one's life in vain.

Sajek in Broadcast Media

Broadcast media such as TV and radio are important and popular advertisement outlets. Various reports related to Sajek are often broadcast on different TV channels in Bangladesh. One of the most noteworthy and popular reports on Sajek is the episode of the show '7up FNF Journey', presented by Farzana Rikta and Al Mamun Zaman and aired on GTV[6]. On the show, they provided information on what sights a tourist might want to see on their visit to Sajek, where they might get lodging, and what kind of food the indigenous

[3] মালাকার, দীপু। (২০১৬). সাজেক: মেঘ পাহাড়ের সীমান্তে। প্রথম আলো, আগস্ট ১৩।

[4] Azreen, M. (2016). Sajek Valley-Where hill touch the sky. The Daily Star, Novembar 17.

[5] মল্লিক, সামির (২০১৬). মেঘের দেশ সাজেক। bdnews24.com, জুন ০৩।

[6] https://www.youtube.com/watch?v=Xk7WdbzET7k

people intake. Of course, the natural beauty is highlighted. All in all, it encourages the viewer to consider taking an informed trip to Sajek.

Other examples of influential broadcasts include reports by Somoy TV[7], aired on January 27, 2017, titled "Sajek Valley adorned with a unique charm at the end of winter," where once again the scenic value of Sajek was underscored and another by Boishakhi TV[8], titled "Mesmerizing Ruilui and Konglak Hills," which mentioned how tourism in Sajek has brought about benefits for businessmen and created jobs for the locals. We can see that the presentation of Sajek via broadcast media creates an eye-catching and alluring image of Sajek, which creates a force of attraction for people to want to tour Sajek.

Sajek in Social Media

In the current day and age, social media occupies a pivotal position in the media. Most people are connected to social media in one way or another. Therefore, social media plays an important role in promoting tourism in the Sajek Valley. Promotion of Sajek Valley via three of the most influential social media platforms will be discussed, which are: Facebook, YouTube, and Instagram.

Facebook is one of the most popular social media platforms in Bangladesh. Therefore, when someone visits a place and shares those pictures on Facebook, everyone on that person's friend list gets to know about it and if the post gets further reach by being shared, it has the potential to go viral and gain a massive audience and the place gets to be known by hundreds and thousands. Facebook provides avenues for not only that but also to find travel companions, experiential knowledge about the tourist spot, and packages for touring through various tour-based groups. It is now being used as a platform for tourism-based businesses. Events are created on the platform for tours to Sajek by various travel groups, which can be availed of in exchange for a specific sum of money.

Instagram is among the popular social media sites in Bangladesh, which people use to upload pictures and communicate and this also helps with the creation and dissemination of the enticing image of a tourist spot. As a result, it can be seen that a considerable number of the respondents were also users of Instagram. YouTube is the largest video networking site currently, which plays

[7] http://www.somoynews.tv/pages/details/70825
[8] https://www.youtube.com/watch?v=6rnhWyivSek

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

an arguably decisive role in tourism in Sajek. It provides an immersive experience for the viewer and the audience gets firsthand information on what it's like to travel to Sajek as they watch various videos uploaded by travel YouTubers.

From the discussion above, it can be concluded that Sajek has gained the most exposure through social media. This medium is also contributing to the creation of a F-commerce industry surrounding tourism by simplifying the process of going on tours, creating ease and comfort by helping find suitable travel mates, and providing transparency through documentation of the journey to and from Sajek.

Role of Media in Tourism to Sajek Valley

The link between Sajek Valley and media for tourists is primarily through social media, as all the respondents are users of some form of it and they aren't even much aware of other media. Among the 12 tourist respondents, all used YouTube and Facebook and 7 used Instagram. The information provided connects the respondents to Sajek in two ways: 1) how they have contributed to the promotion of Sajek by uploading photos to their personal accounts or groups and/or posting reviews; and 2) how they have been influenced by social media to travel to Sajek.

When asked about reasons for uploading pictures and reviews to social media regarding Sajek, the respondents mentioned that: it is a beautiful place; inform others of its existence; encourage others to visit as well; inform others on how to travel to Sajek; create envy amongst friends; document a memory; likes to post on social media generally; for higher engagement in social media through likes and comments; to highlight the difference between them and the indigenous people.

The work of Linnekin (1997) shows that those who are tourists from the mainland of Hawaii romanticize the Hawaiian culture. The same can be observed here; the tourists are creating a romanticized fantasy of Sajek via social media. While examining how the respondents were influenced by social media to travel to Sajek, the following account of respondent 'A' paints a clear picture of the situation:

> My entire plan to come to Sajek was based on information from Facebook and YouTube. There are two groups on Facebook called Travelers of Bangladesh (TOB) and TOB Helpline, which have numerous posts on Sajek giving me a clear idea of

> how to travel here. I watched YouTube for further reference. After the formation of the group to travel here, we posted in TOB helpline to get more groupmates; as a result, the car rent also decreased.

In the above discussion, Media, specifically social media, creates a unique blend of demand for tourism and, at the same time, a supply of tourists; it helps create the perfect ecosystem for tourism to thrive in a spot by filling in the necessary blanks a tourist might need, like lodging, etc. Facebook's role in this is monumental because, in conversation with cottage and restaurant owners, they mentioned that the reviews on their pages help potential tourists pick those places and even call-in advance to book and avoid hassle later on.

The print and broadcast media also play a role in promoting tourism in Sajek. This section illustrates how these media outlets promote Sajek tourism and encourage tourists to visit the valley. Print media often depict Sajek as a "kingdom of clouds," "land of clouds," or the "Darjeeling of Bangladesh." Similarly, broadcast media showcase Sajek's stunning scenery, portraying it as a visually captivating destination. Respondents mentioned that they were influenced by these portrayals, which motivated them to visit Sajek. This demonstrates the media's role in promoting tourism to Sajek Valley.

6. 2. Commodification of Indigenous Culture through Tourism

In the previous discussion, the relationship and role of media with tourism showed how media does not only contribute to promoting and advertising a tourist spot; it also has an economic impact. And where there is money involved, capitalism will inevitably creep in with its fangs of commodification and change the scene as we once knew it. The same can be said for the cases of tourism and indigenous culture, which will be discussed below.

Process of Commodification of Indigenous Culture

The process of commodifying indigenous culture refers to the process by which the culture is converted into a product. The community residing in the Sajek Valley has a culture of their own, which they practice and live by. But this culture itself is changing due to tourism, which includes their lifestyles and choice of profession as well. Tourists come to Sajek to visit and the local populace has shifted their line of work to meet the demands created by this phenomenon. This change in profession has brought about progress from an economic point of view. There are many stakeholders involved in the tourism sector in Sajek. The media is playing an important role in terms of publicity. Thus, people from different cultures residing in different places are visiting Sajek and getting acquainted with a new culture.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Goodwin (2007) shows in his work how tourism alleviates poverty in small indigenous populations. And in it, he showed that tourism provided a solution to the unemployment problem through the direct sale of the supply of goods and services pertaining to tourism by the economically challenged and catalyses the establishment of various small business establishments, etc. Sajek has gone through a similar journey. Instead of their previous occupation of jhum farming, they have taken to businesses such as shops and restaurants; Indigenous women have opened coffee shops and sold their traditional items as products.

In this process of transformation, different parties play a role in turning culture into a commodity. Notable among them are tourists, local indigenous communities, media, modern technology, development, etc. The role of each one is discussed separately below.

Role of Tourists

Tourists play a major role in the commodification of indigenous culture because, in the tourism market of Sajek, the tourist is the consumer and buyer for whom traditional items are sold as products, catering to their tastes in exchange for currency. Various travel packages can also be availed of for money. Some of the sectors in which a tourist spends money on a trip to Sajek include car rental, resort rent, purchase of hobby items, etc. And one spends this money for one's own satisfaction. Taking a look at the activities tourists engage in in Sajek, some common activities can be seen.

Tourists take plenty of pictures and videos of the scenery, indigenous people, and their cultures and circulate them on social media. They also tend to have a fascination for the local food and definitely eat it as part of the tourist experience. The cuisine of the Sajek Valley people includes various dishes cooked within the local indigenous people's own bamboo cooking tradition?, such as bamboo chicken, bamboo biryani, bamboo tea, spinach boiled, *egg kebang*, or vegetables made of bamboo curls. Tourists buy fruits such as locally produced bananas, papayas, *marfa* (A types of Cucumber), etc. to take back with them.

Exploring the local historic origins of a culture is another activity that tourists pursue religiously. The case of 'Lushai Vangkhua' is interesting in this regard. '*Lushai Vangkhua'* translates to 'Lushai Heritage Village' in English, referring to the ancestral home of the Lushai tribe. However, Lushai Vangkhua is not authentic per se; it has been manufactured to resemble what a Lushai village

from the past would have looked like. It contains their kings' houses, princess houses or training centers, and many other structures. Two cottages are present, which are built to replicate Lushai housing. The daughter of the headman of the Ruiluipara built this Lushai traditional village, as the present Lushai village is no longer the same as before. The traditional items once used by the Lushai have also been placed in the village. A tourist can explore the whole village and take pictures if they rent the cottage. But if someone wants to just explore, it can be done for 30 taka per person. Traditional dresses of the indigenous people can be worn and pictures can be taken for 100 takas. One thing to note here is that through this village, their cultural content is being given in exchange for money. That is, they see it (culture) as a product.

Tourists visiting Sajek not only take in the breathtaking nature around them but also get familiar with a different culture. Since the tourist is the consumer, they receive this experience in exchange for capital, which has been further echoed by Bobin Tripura (32) as follows: "Many times, tourists come and offer to see our traditional songs or dances. They offer money in return. Then we perform the songs and dances. And while dancing, the girls wear our tribal clothes. And of course, they pay for it."

As seen from the discussion, most variables involve a relationship with money. The tourists get their services, pleasure, and benefits by spending money; they buy various elements of indigenous culture in exchange for capital. From this point of view, indigenous culture is considered a commodity, and tourists are the main target group.

Role of the Local Community

Just as tourists play an important role in the commodification of indigenous culture into a commodity, the population living in the area also has a major role in this process. Goodwin (2007) shows that tourism becomes a key factor in changing the conditions of the poor local population. They make a living through it and it brings change to their way of life.

Tourism in Sajek has led to a change among the local people and they no longer suffer as they used to; their way of life has become easier. The influx of tourists has led to a shift in profession and financial solvency, which is why they willingly commodify their culture as a means of selling. The following discussion sheds light on how they do so.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

The owners of the various resorts and restaurants are people from the local community. They have opened these establishments to facilitate the arrival of tourists to Sajek, as this would bring in money. The demands of the visitors are looked upon with utmost importance from a business point of view. As a result, it can be seen in restaurants that alongside their traditional dishes, they also cook the dishes readily available in the city. Among their traditional foods, which tourists like most, are bamboo chicken, bamboo biryani, *bamboo curls*, different types of *bharta* (Mashed Item), vegetable boils, etc. The indigenous people used to cook everything inside the bamboo as a part of their cultural heritage.

Again, the indigenous restaurants are often built in their traditional way, which attracts tourists. Chimbal Restaurant is one such example. The entire infrastructure of this restaurant is decorated with bamboo. The walls have engravings of traditional Lushai works. The water containers are earthenware. Books have been kept as well to alleviate any possible boredom among tourists.

Another observation is that tourists buy local clothes from various shops in Sajek. 'Sajek Fashion' is one such store. The clothes of the local indigenous people are sold there. Clothing style is an integral component of any culture and tourists are able to buy it easily.

According to Linnekin (1997), tourism creates an economic situation in which culture automatically becomes a market product. The local people participate in this market due to economic reasons or political pressure. In the case of tourism in Sajek, it is seen that the local indigenous population participates in this tourism market to survive. They put their culture in the hands of the market for its economic benefits. However, the primary data does not indicate that the locals participate in tourism due to political pressure.

Role of Development and Modern Technology

Sajek Valley was developed as a tourist destination as part of a development project. As a result, one can travel to Sajek from Dhaka by road, whereas just a few years ago, one had to travel there by foot. The roads are even paved now. It was such a remote area that it took two days for the locals to go to the market, but now it takes two-three hours. Cars can be used to travel there as well. Four local cars go back and forth every day. Tourist escorts go twice a day.

Due to improvements in transport and communication, a lot more tourists travel to Sajek now. Respondents have corroborated this information as well. Tourists say that if there were no roads or transportation facilities, they would not have come here because it is a remote area. The start of car travel also helped solve the water problem in Sajek. Previously, water had to be collected from the bottom of hills on foot; now it is lifted using pumps and transported using cars. Almost every cottage and restaurant have solar systems and generators as well, along with an electricity line from the grid. And all these development initiatives encourage more tourists to go to Sajek.

Role of Other Parties

It's not just tourists, indigenous people, or the media who are involved in the process of transforming culture into a commodity. Apart from this, other parties participate in this process. The first stakeholders in this discussion are the owners and managers of the Bengali hotels at Sajek. They are neither indigenous nor local, but have started to live in Sajek for business purposes. They want more tourists to come in, as it will bring in more business. They are providing services to tourists via cottages and restaurants. They sell the various traditional products of the indigenous people and cook to sell the traditional food of the indigenous people. They are directly participating in this commodification process.

The second set of stakeholders who play a role are the various event organizers, who bring tourists to Sajek through their events. Their main focus is usually giving tourists a taste of the traditional local culture of Sajek, which is why tourists gravitate towards traveling with them. Linnekin (1997) mentions that after travel companies took over the tourism industry in Hawaii, the Hawaiian culture was viewed by tourists as systematized, clichéd, and depreciated, and the culture was thus further commoditized. The same can be seen in the case of Sajek. Many travel companies have been formed based on Sajek, which are playing a big role in the transformation of indigenous culture into a commodity by taking tourists to Sajek at affordable costs.

As can be seen in the above discussion, there are contributions from different stakeholders to turning culture into a commodity. Goods are those that are transferable in exchange for money. After Sajek became a tourist center, the culture of the indigenous people residing there has also been subjected to being handed over in exchange for money through the transfer of various elements of the culture. The sellers are the indigenous peoples; media, development, or

event organizers play a role in making this process easier, smoother, and faster, oftentimes initiating and/or facilitating it as well.

6.3 Commodification of Indigenous Culture and the Impact of Media

The theoretical concept of 'commodity fetishism' is provided by Marx in the first section of his book titled- Capital: A Critique of Political Economy (1959). According to him, this is the tendency to hide the social type or nature of the product produced through the market economy. That is why products are presented in the market with prices, where the price is the ultimate factor. Commodity fetishism means materialism, where goods/products hold the most importance in the market economy.

This phenomenon can also be seen in the case of tourism in Sajek. Objects/products hold the most importance. Through tourism, the indigenous culture is considered a product. This product is manufactured, and as a result, the original meaning, activities, or culture are overshadowed and hidden. The indigenous people become invested in how to please consumers/tourists and thus offer resorts, cottages, and restaurants in exchange for money. Again, other parties involved in tourism also cooperate in different ways to exchange this culture. Tourists go to Sajek and pay more attention to the culture of the indigenous people than they give importance to the indigenous people; for example, they like local traditional food, clothing, etc. And this is how the concept of commodity fetishism is associated with tourism in Sajek.

'Consumer fetishism' is a concept first discussed by Arjun Apadhurai. Whilst describing mediascapes from his scape theory, Appadhurai says that consumer fetishism is an idea as such that the individual (agency) turns into the consumer through 'commodity flow.' And this primarily happens through the influence of the media. Advertising is also an important factor in the formation of this consumer. As a result, a kind of fiction is created about reality. The essence of consumer fetishism is to transform an individual into a consumer through media and advertising by blurring the actual state of the product and creating a kind of demand or a capital flow (Appadhurai, 1990).

The tourists have turned into consumers by buying and enjoying everything in exchange for money. This is completely facilitated by the media, as we see in the case of Sajek. As seen from the previous discussions, Sajek is portrayed as the 'kingdom of clouds', 'Darjeeling of Bangladesh,' etc., and the indigenous culture is also highlighted in the media. This creates a fiction in the minds of

individuals about the reality and due to this fantasy, individuals become curious and interested in going to Sajek. As a result, a capital flow can be seen to be created amongst the local population, businessmen, event organizers, and tourists. This happens due to the increasing demand pertaining to Sajek travel initiated by the media.

Extending the discussion above on the fictification of reality and the creation of consumers, one of the reasons why tourists visit Sajek is the social media posts of reviews by others. This adds a new identity to the tourist as a 'producer' and therefore the tourist ceases only to be a consumer (cf. Smith, 2001). The culture of going to Sajek is mass-produced by the different forms of media This is in line with Adorno and Horkheimer's theory of 'culture industry' and what it effects.

This portrayal further creates a sense of urgency and essentialism of having to go visit Sajek, which brings into play another aspect of the culture industry that the media sets the tone for what should or should not be, can or cannot be done and places an invisible veil of control over people's lives. The culture industry also creates consumers who do not practice critical thinking while making decisions, which is reflected in the immense influence social media holds over potential tourists who go to Sajek.

In summary, the commodification of indigenous culture in the Sajek Valley, fueled by the tourism industry and accentuated by media influences, reflects a transformative process where cultural elements are converted into marketable products. This evolution has not only altered the traditional lifestyle and professions of the indigenous community but has also brought economic progress to the region. With diverse stakeholders involved, including indigenous sellers and the media, the exchange of cultural elements for monetary gain has become a complex and multifaceted phenomenon. The theoretical underpinnings of commodity fetishism and consumer fetishism, as presented by Marx and Appadurai, respectively, illuminate the intricacies of this cultural transformation. As tourists transition into consumers influenced by media narratives, a capital flow is generated, creating a demand for Sajek travel experiences. The culture industry, as theorized by Adorno and Horkheimer, reinforces this commodification by shaping perceptions and fostering a sense of urgency, ultimately exerting a subtle but pervasive control over individuals' decisions. The influence of social media, reviews, and the mass production of the culture of visiting Sajek further underscores the impact of media on constructing consumer identities. This intricate interplay demands

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

a critical understanding of the profound implications of commodifying indigenous culture in the contemporary tourism landscape.

7. Conclusion

This study began by posing several questions. These include: What is the role of the tourism industry in the commodification of indigenous culture, and how is this process organized? What roles do different parties in the tourism industry play, and what changes occur as a result of transforming culture into a commodity? Through this research, we found that local indigenous people, tourists, media, and various tourism-related businesses all play a part in commodifying indigenous culture through tourism. Tourists act as consumers in this process, receiving services and experiences in exchange for money, and all other activities are conducted to satisfy their needs. The indigenous people become vendors, selling their own culture in the tourism marketplace, which has been created and sustained by the tourism industry.

The media plays a crucial role in this process by connecting consumers (tourists) with sellers (indigenous people). Through media channels, tourists are made aware of destinations like Sajek Valley, and the marketing process is organized. Another significant factor is infrastructure development. Since Sajek is a remote area, tourist arrivals and the creation of this tourism market would not have been possible without the development of transportation and other facilities.

As tourism has expanded in Sajek, there have been noticeable changes in the culture of the indigenous people. Their food, clothing, and language have all been influenced. For example, while they once spoke primarily in their native tongue, they now often speak Bengali. In preparing and selling traditional food for tourists, they are also becoming accustomed to Bengali cuisine. Additionally, changes in their way of life are evident. They no longer live as they once did, as many are now involved in tourism-related professions, which has made their lives easier. However, this does not apply to everyone—those who do not benefit from the tourism industry still face hardships, particularly as the cost of living has increased due to the rise in commodity prices linked to tourism. Further research can be conducted by delving deeper into the exchange of cultures and its impact on the native culture due to tourism during the process of cultural transformation through commodification.

Acknowledgement

This paper owes its completion to the ardent support of the Department of Anthropology at the University of Dhaka, as it is part of the principal author's undergraduate monograph. We extend heartfelt gratitude to the esteemed faculty whose profound anthropological expertise formed the core of this study. We are profoundly indebted to our research supervisor, Fahmid Al Zaid, whose guidance was pivotal in bringing this research to fruition. Acknowledgment goes to the indigenous community in Sajek, the invaluable tourists, and our dedicated informants, whose spontaneous involvement was indispensable in this study. We are thankful to the authors and researchers whose works contributed significantly to this research. Our gratitude extends to the diligent officials and staff of the Seminar Library at the Central Library and the Anthropology Department of Dhaka University for their help. Finally, we appreciate the Editor and anonymous reviewers whose constructive feedback significantly enhanced the manuscript's quality in its earlier stages.

References

English sources

Ahmed, H. S. (2017). *Tourism and State violence in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Electronic Thesis and Dissertation Repository.

Ahmed, S., Shamsuzzoha, A. T. M., & Zarif Rahman, M. (2023). Developing Inclusive Tourism in Chittagong Hill Tracts (CHT): A Case Study on Sajek Valley, Bangladesh. *Asian Review of Social Sciences*, 12(2), 1–9. https://doi.org/10.51983/arss-2023.12.2.3510

Al Sajib, S.M.S., Sohad, M.K.N. (2021). Retraction Note to: When Culture Becomes Commodity: Tourism and Development in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. In: Hassan, A. (eds) *Tourism Products and Services in Bangladesh*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4279-8_22

Appadurai, A. (1990). *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy: Theory, Culture & Society.* SAGE Publications.

Azreen, M. (2016, Novembar 17). Sajek Valley-Where hill touch the sky. The Daily Star.

Beaver, A. (2002). *A Dictionary of Travel and Tourism Terminology*. Wallingford: CAB *International*

Dragstedt, A. (1976). Value: Studies by Karl Marx. London: New Park Publications.

Goodwin, H. (2007). Indigenous tourism and poverty reduction. In R. Butler and T. Hinch (Eds.) Tourism and Indigenous peoples: Issues and implications (84-94), Oxford: Butterworth Heinemann.

Hasan, R. K. B. a. M. (2021, November 28). Tourism's share 3.02% in GDP. *The Daily Star*. Retrieved from https://www.thedailystar.net

Horkheimer, M., and Adorno, T. (1972). Dialectic of the Enlightenment. London: Allen Lane.

Lenin, N. (1998). *Waterfall of Peace at the Jhum Hills: The Historic Chittagong Hill Tracts Peace Treaty.* Dhaka: Gonhoprokash.

Linnekin, J. (1997). Consuming Cultures: Tourism and the Commoditization of Cultural Identity in the Island Pacific. In M. Picard and R.E. Wood (Eds.) *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies* (215-250). Honolulu: University of Hawai'i Press.

Marx, K. (1959). *Das Kapital, a critique of political economy*. Chicago: H. Regnery,

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

O'Gorman, K. D., & Thompson, K. (2007). *Tourism and culture in Mongolia: the case of the Ulaanbaatar Nadaam.* In Elsevier eBooks (pp. 161–175). https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-6446-2.50020-x

Pearch, P. (1982). The Social Psychology of Tourist Behavior. Oxford: Pergamon.

Roy, M., Sharmin, Z. (2021). Consumer Demand for Ecotourism Products and Services in Sajek Valley of Bangladesh. In: Hassan, A. (eds) *Tourism Products and Services in Bangladesh.* Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4279-8_10

Roy, S. C., & Roy, M. (2015). Tourism in Bangladesh: Present status and future prospects. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 1(8), 53–61. https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.18.1006

Schendel, W. V. (2002). *A Politics of Nudity: Photographs of 'Naked Mru' of Bangladesh*. Modern Asian Studies, 36(2), 341–374. doi:10.1017/S0026749X02002032

Schendel, W. V., Mey, W., Dewan, A. K. (2001). *The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland.* Dhaka: The University Press Limited.

Smith, P. (2001). *Cultural Theory: An Introduction*. Blackwell Publishers.

TBS Report. (2020, September 27). Popular tourist spots of Bangladesh. *The Business Standard*. Retrieved from https://www.tbsnews.net

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2020. (2020). WTO World Tourism Barometer, 18(1), 1–48. https://doi.org/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1

Bengali sources

Akhteruzzaman, S. (2015). *Tourism in Bangladesh*. Dhaka: Chayabithi. [আখতারুজ্জামান, সৈয়দ. (২০১৫). *বাংলাদেশের পর্যটন।* ঢাকা: ছায়াবীথি।]

Howlader, M. Z. H. (2014). *Tourism*. Dhaka: Vashaprokash. [হাওলাদার, মো: জিয়াউল হক (২০১৪) *ট্যুরিজম।* ঢাকা: ভাষাপ্রকাশ।]

Lenin, N. (1998). *The Fountain of Peace in the Jhum Hills: The Historic Chittagong Hill* Tracts *Peace Treaty*. Dhaka: Gano Prokashan. [লেনিন, নূহ-উল-আলম. (১৯৯৮). *জুম পাহাড়ে শান্তির ঝর্ণাধারা: ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি।* ঢাকাঃ গণপ্রকাশ।]

Malakar, D. (2016, August 13). Sajek: At the Border of Clouds and Mountains. *Prothom Alo.* [মালাকার, দীপু। (২০১৬, আগস্ট ১৩). সাজেক: মেঘ পাহাড়ের সীমান্তে। *প্রথম আলো.*]

Mallik, S. (2016, June 03). The Land of Clouds: Sajek. *bdnews24.com.* [মল্লিক, সামির (২০১৬, জুন ০৩). মেঘের দেশ সাজেক। *bdnews24.com*.]

Audio Visual

Boishakhi Tv News. (2019, February 28). Mesmerizing Ruilui and Konglak Hills [Video file]. *Retrieved* from https://www.youtube.com/watch?v=6rnhWyivSek

Somoy News. (2017, January 27). Sajek Valley adorned with a unique charm at the end of winter. Retrieved from http://www.somoynews.tv/pages/details/70825

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Sense of Belonging amongst the Khasis in Bangladesh: Some Theoretical Considerations on Mobility

Eshita Dastider[1]and Akbar Hussain[2]

Abstract

This article highlights some theoretical argument on mobility and how it pertains to the sense of belonging of the Khasis in Bangladesh. The indigenous Khasis live in northeastern highlands of Bangladesh. . This research shows that internal and external mobility has long been a common livelihood practice among the Khasis. They engage in different forms of mobility, including both internal movements and cross-border interactions. Diverse mobility patterns reveal varied narratives and experiences, highlighting the constraints and actions that significantly influence both immobility and their sense of belonging. Through their experiences of mobility along with immobility, the Khasis negotiate their existence and preserve their indigenous identity, relying on traditional social systems in the uncertainties existing in Bangladesh. Within the broader theoretical framework of mobility studies, we argue that mobility encompasses elements of immobility, shaped by diverse social construction and intangible factors that intertwine with the ideas of migration and physical movement between places, including return journeys. The complex networks and practices of mobility, existing realities, and connections have fostered a compound sense of belonging, linked with Khasi immobility. This linkage extends to the hills, Punji settlements, betel leaf production, the Khasi social system, and the evolving global landscape.

1. Introduction

This article is based on the theoretical understanding of the mobility of the Khasis in Bangladesh and how mobility contributes to the formation of their sense of belonging. It includes insights into their movement, matrilineal social system, cultural identity, distinct subsistence economy, and attempts to establish a coherent understanding of how mobility and immobility interplay within the narratives that signify their struggles and survival as an indigenous group in Bangladesh. The Khasis of Northeast Bangladesh continue to be mobile for multifaceted reasons. Due to scarcity of research on the mobility patterns of the Khasis, this research endeavors to compile appropriate reflections that highlight their patterns of mobility, experiences, and narratives,

[1] Adjunct Faculty, Department of Sociology and Anthropology, Asian University, Dhaka, Bangladesh. Email: edastider@gmail.com
[2] Professor of Anthropology at Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, Bangladesh. Email: akbarju@juniv.edu

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

all contributing to their sense of belonging. Mobility and its connection to the belongingness of the Khasis involve various underlying mechanisms that exhibit the relationships among different segments of the Khasis. It scrutinizes the interactions between established Khasi residents in *Punji* (Khasi settlements in the Sylhet division are commonly known as *Punji*) and those who migrated, the dynamics between affluent Khasi households and underprivileged individuals, tensions between adherents of traditional Khasi beliefs and Christian followers, as well as the rapport between the Khasi community and neighboring Bengali settlements along with the local Bengalis. Furthermore, it observes the distant relationship networks, both spatially and psychologically, with Khasis residing across the border. In this regard, it is important to understand how the existing practices and networks of mobility contribute to the belongingness of the Khasis. However, this involves attachments to the hills, *Punji* life, betel leaf production, and the Khasi social system, juxtaposed with the altered reality of the contemporary world. This research primarily aims to study systematically and reasonably how the experiences of mobility of the Khasis are influenced by the constraints and activities in everyday life. Mobility manifests through diverse movements of people, objects, ideas, and concepts driven by various motives, signifying a perceived transformation within Khasi society and their sense of belongingness.

Khasis are actively engaging in fostering an independent economy and nurturing their self-esteem to redefine their position, employing new survival techniques, and accepting mobility for livelihood. This study also explores how Khasis establishes a sense of belonging while navigating the complexities of mobility. Exploring the power dynamics between Bengali majority and minority indigenous groups involves examining the formation of minority identities and the actions taken by these marginalized communities, particularly the Khasis, who have experienced social and national devaluation due to their indigenous identity. Various factors contribute to their mobility and immobility, including their traditional subsistence system, environmental changes, employment opportunities, property management, settlement issues, pursuit of higher education, and adherence to marital laws. Moreover, there are also mobile traders and seasonal laborers among the Khasis, often motivated by educational pursuits influenced by their Christian religious beliefs. Additionally, alongside internal mobility, they are engaged in cross-border movements, directly influencing their immobility and an intangible sense of belongingness. While some individuals engage in cross-border mobility from the selected study areas, many respondents have never attempted such travel

across the border. The study extensively examines the correlation between mobility and immobility, highlighting how various mobility patterns intersect with the immobility experienced by a significant number of Khasis. Mobility takes on diverse forms linked to the prevalent immobility among the Khasis, establishing a profound interconnection between them.

2. Theoretical Perspectives

Theoretical discourse within migration studies begins with neoclassical economic theories, which present macro perspectives grounded in the individual's role within the global labor supply and demand processes. Despite acknowledging historical ties, familial and community dynamics, and the role of nation state in labor recruitment via permits, migration policies encompassing refugees and asylum seekers, and the shaping of citizenship rights have been neglected in neoclassical economic theories (O'Reilly 2015:25). This framework critically and intricately analyzes migration through push/pull factors; new economic theory is further 'critical and sophisticated version' of neoclassical migration theory (Arango 2004:23). Following this, the world system theory broadens the focus to perceive the world as a singular capitalist system. Less privileged nations are viewed as peripheral providers of inexpensive labor to sustain the core-the wealthier and influential nations globally (Wallerstein 1974). Rooted in Marxist political economy, the world system theory highlights the global, attributing poverty to historical power dynamics, dependency, and indebtedness. Migration, within this theory, has been regarded as an element of dominance, operating with structural factors and economic control to perpetuate the system (Portes and Walton 1981). However, similar to other theories, it encounters criticism for economic bias and disregards political and cultural processes (Massey *et al*. 1993: 446). In migration system and network theory, S. Castle and M. J. Miller (2009) propose that migration studies ought to cultivate comprehensive systems or networks vital for comprehending sophisticated relationships between structures and agencies. Particularly, these theories emphasize social structure and individual actions, examining intermediary agents and the decision-making processes influencing the output of migration.

The study of mobility and belongingness within the migration process has increasingly become a focal point within a specific field of academic inquiry. Another significant aspect explored in mobility studies involves conceptualizing mobility as an influencer for social differentiation, contributing to the establishment of power dynamics and marginalized communities. T. Cresswell (2010:21) termed this new mobility paradigm as the

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

'politics of mobility'. Within this framework, mobility can evolve into a type of capital, akin to economic, social, and cultural capital (Bourdieu 1986:21). R. King and R. Skeldon (2010:1640) further elaborate that mobility creates an integrated system that operates across various scales: from the micro-level of families and households to the meso-level of communities, extending further to the macro-level of nations and the interconnected network of countries influenced by migration flows. Noel B. Salazar (2019:13) distinguishes between migration and mobility, highlighting their intersection while emphasizing that they are not synonymous. Migration studies offer an opportunity to explore every aspect of the migratory process, encompassing and defining mobility. It is important to note that not all movements hold equal significance or shape life experiences for all individuals, particularly those who are immobile. Mobility studies prompt new inquiries into traditional migration studies rather than introducing entirely new subjects for academic exploration or forming a new discipline.

Mobility gains significance within the context of social, cultural, political, and historical frameworks, each of which possesses its level of mobility. A "mobility turn" in migration research marks a shift in social science studies, addressing various forms of movement (Faist 2013). This new paradigm in mobility suggests a fresh approach to analyzing the movement of people, objects, ideas, and concepts, viewing them through the lens of mobility itself. It critically reflects on the fundamental political assumptions concerning the link between spatial and social mobility, addressing the proximity between labor migrations and mobility. This paradigm shift also raises questions about the legitimization of social inequalities evident in movements across borders. The new paradigm confronts several assumptions within social science, including static and enclosed concepts of culture and society used in analysis. For instance, established concepts like center-periphery or rural-urban dynamics in human society linked with economic deprivation and a sense of freedom, alongside immobility associated with oppression, have been re-examined through the lens of mobility in social science (Salazar and Smart 2011).

Mobility studies emphasize the ethical aspects of mobility and their correlation with immobility. Nina Glick Sheller and Salazar (2013) highlighted the significance of the embodied nature of movement practices and their corresponding representations, ideologies, and the significance attributed to mobility and immobility equally. Mobility research examines territories, borders, and scales, engaging cultural discourses, representations, and

frameworks to establish a coherent understanding that links social issues such as inequality, power dynamics, and hierarchies. The study of mobility scrutinizes the processes, structures, and consequences of the movement of people, resources, goods, and ideas. Mobility research does not exclusively focus on the physical or material aspects of movement; it encompasses potential and obstructed movement, immobility, habitation, and place-making as well (Bucher and Urry 2009). This field of study involves analyzing the intertwined movements of people and their tangled relational dynamics.

Schiller and Salazar (2013) provided a critical discussion on migration, mobility, immobility, transnationalism, methodological nationalism, and ethnography. Previous studies on mobility were conflicting, as the concept of 'methodological nationalism' created a division between mobility and immobility, constructing an oversimplified narrative that glorifies mobility while relegating immobility to a status of normalcy. This approach generated an idealized portrayal of mobility as glamorous and a transgression while portraying immobility as ordinary and unremarkable. In the exploration of the 'regimes of mobility,' they proposed an examination of the complex relationships between the experiences and imaginaries of migration, as well as the interaction between mobility and immobility. Mobility studies shed light on how the cultural practices of inhabitants transcend fixed boundaries, integrating into diverse spatial networks and temporal connections. The term mobility itself embodies concepts of governance and dominance, highlighting ongoing efforts to understand, question, embody, celebrate, and alter categories related to similarities, differences, belongingness, and strangeness. The approach to the regime of mobility needs to evolve beyond a fixed understanding of mobility and autonomously explore it as a feature of new constraints and methods of exploitation. This approach also enables researchers to identify the types of social interactions that foster both shared commonalities across different spaces and differences, as well as collective place-based identities.

Schiller and her colleagues aimed to present a fresh theoretical model for interpreting existing migration, focusing on two key aspects: historical and theoretical. From a historical perspective, they argued that immigrants nowadays differ qualitatively from those in the late 19th and early 20th centuries. The earlier immigrants, they observed, severed social and cultural ties with their places of origin, situating themselves exclusively within the socio-cultural, economic, and political framework of the receiving society. Their 'regimes of mobility' approach enables researchers to identify forms of

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

sociability that foster commonalities across space and differences, as well as collective place-based identities (Schiller and Salazar 2013). This framework outlines six points to comprehend mobility: i) Highlighting the interconnectedness between mobility and immobility, which defines mutually each other. ii) Understanding the evolving definitions of mobility and immobility within contexts of unequal power dynamics. iii) Recognizing how socio-political, cultural, and economic capital production shapes these unequal relationships within particular local contexts. iv) Interrogating situations where certain types of mobility or mobile individuals attract admiration, disapproval, desire, suppression, or anxiety. v) Challenging the understanding of class by considering the capability and authorized right to mobility as criteria defining and maintaining class privilege. vi) Perception of time and space (history) is shaped and reflected by the discourse on mobility and immobility.

Although recent studies displayed a rejection of the notion of a strict dichotomy between mobility and immobility, recognizing these as intertwined and asymmetrical forces (Siraj and Bal 2017). Traditional migration studies often fail to acknowledge the historical backdrop of present-day migration and how it affects those who remain immobile. Acknowledging the constraints within conventional migration research, this study adopts mobility studies to amplify the perspectives and encounters of those who are immobile yet linked to mobility and shared experiences. The existence and preservation of indigenous identity through their experiences of mobility and immobility is focusing on the transformation of traditional social systems of Khasis amidst the uncertainties existing in Bangladesh. Mobility studies, an emerging interdisciplinary field, serve as the foundation for this research, aiming to unravel the mobility dynamics of the Khasis and their sense of belonging within the context of Northeast Bangladesh.

a. Mobility, Ethnicity, and the Perspectives of Khasis in Bangladesh

For many years, anthropologists have directed their focus toward the indigenous people residing in forests, highlands, deserts, and riversides within various European colonies. The psychological and material reality of these communities remains inseparable from their surroundings space, earth, ecological terrain, or governing entities. The extensive colonial history of South Asia has witnessed multiple layers of transformation. British rule in this region effected a lasting division between indigenous peoples and national communities, primarily established by land settlements that formed the foundation of state building. This approach led to the establishment of a private property system for agricultural land (van Schendel 1992, 2001). The historical

context of constitutional representation and colonialism underscores the enduring disparity between the *primitive* or *savage* indigenous peoples and the *civilized* and sophisticated Bengalis, a concept articulated as 'tribalist discourse' (van Schendel and Bal 2002). Ethnic groups are generally characterized by their relationship with other groups, often delineated by various types of boundaries: racial, cultural, linguistic, economic, religious, and political, among others. T. H. Eriksen (2005) defines a minority as a group that holds numerical inferiority within a society that lacks political dominance, and is perpetuated as an ethnic category. He further notes that a minority only exists concerning a majority, with their dynamic defined by the relevant system boundaries. Presently, these boundaries often align with state borders, and shifts in these boundaries lead to alterations in majority-minority relationships within societies. Eriksen (2005) suggests that ethnic identities are formed from both internal and external sources, as products of self-definition and external definitions. The relationship between these dimensions is dynamic and flexible.

Fredrick Barth (1969) pioneered a shift in the approach to ethnicity, moving from static viewpoints to interactive ones. Challenging anthropologists who compare ethnic groups with distinct cultural entities, Barth formulated a model for analyzing ethnic relations. His model shifts the spotlight away from 'culture,' emphasizing instead the importance of 'boundaries that delineate groups, downplaying the significance of 'cultural elements.' According to Barth, fixating on the unique cultural aspects of ethnic groups incorrectly assumes their isolation. He contends that shared culture might emerge from long-term social processes rather than being an innate group characteristic. Culture within an ethnic group can evolve, and established boundaries can dissolve with the formation of new ones. Barth (1969) specified that ethnic identities are not rigid but adaptable and fluid, shaped by individual behavior and decision-making processes. Ellen Bal (2007) investigates into the evolution of the Garo identity, revealing its cultural distinctiveness within the multifaceted historical context of South Asia and the wider global landscape. Employing a situational approach to culture and identity, she advocates for a conceptual transition from tribes to ethnic groups and from culture-centricity to the concept of boundaries. This shift from tribal to ethnic categorization signifies a move away from a static viewpoint to a more dynamic understanding of social groups and their demarcations. She meticulously considers the historical processes involved in defining boundaries, encompassing broader socio-economic and political contexts, rather than solely emphasizing superficial cultural aspects.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

In general, ethnicity refers to a group identity based on shared culture. The concept of ethnicity gained prominence in anthropology during the 1960s, particularly with the classic debate initiated by Clifford Geertz (1963) and Fredrick Barth (1969) regarding primordial and situational theories of ethnicity, both within and outside the field of anthropology. Barth proposed that the primary task of anthropological studies on ethnicity should be to understand the maintenance and consequences of ethnic boundaries. According to anthropological literature, an ethnic group is typically defined as a population that is biologically self-perpetuating, shares fundamental cultural values manifested in cultural forms and communication, has a membership that self-identifies and is identified by others as a distinguishable category, separate from others of the same order. Cultural variations do not create boundaries themselves. However, if the dichotomization between two ethnic groups persists, and if state borders between their countries become permanent, various aspects of their cultures and languages gradually become more distinct. In modern state formations, multiple ethnic groups with distinct religious practices, language groups (e.g., Bengali-speaking people with diverse religious beliefs and rituals, yet maintaining common Bengali cultural practices), and diverse traditional practices and identities coexist within the boundaries.

According to M. Nash (1996), blood or kinship, communal dining, and the substance of religious beliefs and practices primarily characterize ethnicity. However, these elements are not easily understood in terms of interactions among different ethnic groups. Nash identifies other key features of ethnicity as traits such as clothing patterns, language, and cultural practices like circumcision, scarification, or tattooing. Additionally, he mentions other distinguishing features such as house architecture, interior arrangements, ritual calendars, specific taboos, medical practices and beliefs, economic structure and practices. These distinctive traditional practices and belief systems confer a sense of authority, legitimacy, and rightness upon ethnic communities (Nash 1996:24-25), enabling them to maintain their differences and identity from other groups based on specific socio-cultural characteristics. Identities are contested, negotiated, and constructed through the interactions between ethnic groups. Communities differentiate themselves based on various defining factors; for instance, the Khasi people or *Punji* inhabitants still perceive themselves as part of the broader Khasi community inhabiting the Khasi and Garo Hills of Meghalaya, India. In line with the concept of imagined community (Anderson 1983), this research observes that the Khasis of Bangladesh consider themselves part of a larger community of Khasis, despite

the division between the Khasi and Garo Hills following the partition of India and Pakistan in 1947. Ethnic identity transcends geographical boundaries; transnational social spaces and socio-political institutions acquire new significance and roles through cross-border communication. It is imperative to examine the implications of changing institutions in local, national, and international spheres within transnational spaces. The historical settlement of the Khasis in this region and the illustrious history of the Khasi kingdom of Jaintia state contribute to their self-perception as Khasis and their identification as an imagined community. Given the sensitivity and controversies surrounding indigeneity in Bangladesh, indigeneity could have been understood in terms of both indigeneity and marginalization. This research demonstrates how Khasis negotiate their indigenous identity within the framework of constitutional representation and mainstream ideology. The Khasis in Bangladesh are grappling for sustenance and livelihood amidst various disparities. The complex political landscape in Bangladesh, marked by structural inequalities, ethnic exclusion, and human rights violations, significantly affects the minority ethnic population.

The Khasis originally settled in the Khasi Hills and the Jainta Hills of present-day Meghalaya, India, tracing their origins back to the prehistoric era (Hussain 1991:80). Approximately five hundred years ago, they migrated from Meghalaya to the greater Sylhet region of Bangladesh. Archaeological, historical, and linguistic evidence collectively suggests that a group of Austric-speaking people established their control in present-day Myanmar around the 11th century, upholding a matrilineal family system and likely serving as the ancestors of the modern Khasis (Bareh 1967:15-19). Following the decline of this kingdom, their settlement shifted to Assam. P. R. T. Gurdon (1914:10-11) additionally documented the settlement of a Mon-Khmer group in the Khasi-Jainta Hills of Meghalaya from ancient times. Historical and linguistic evidence further supports the idea that the Khasis are descendants of the Mon-Khmer People (Brightbill *et al.* 2007). Moreover, in the 16th century, Khasis relocated from Assam to the Jaintapur area, Sylhet district of Bangladesh marking another phase of their migration.

Geographically and historically, the Khasi-Jainta Hills in Meghalaya have been linked to the northeastern region of Bangladesh. S. K. Chatterjee (1928:126) noted that the Khasis once occupied extensive settlements across the plains of Sylhet and Kamrup before being confined to the Khasi and Jaintia Hills. The Khasis traditionally depend on forest resources, hilly cultivation, and tree-based farming, cultivating various shrubs, herbs, and vegetable species for

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

sustenance. Some vegetation may resemble ordinary bushes in the nearby forest, yet it significantly influences the growth of plants and crops by enriching topsoil nutrients (Patam 2005:177-180). In Bangladesh, Khasi settlements are known as *Punji*, forming clusters of houses within their cultural boundaries. There are one hundred and six *Punji* in the Sylhet division. A total of fourteen *Punji* are situated in the Sylhet district, eighty eight *Punji* in the Moulavibazaar district, and two of each in the Sunamganj and Habiganj district (Patam 2005:188-189, Chowdhury 2016:56-59). In the quest for better livelihoods, they frequently migrate between *Punji* for new farming land and household settlements. In the past, Khasis in Bangladesh resided near the Northeast hilly border of Sunamganj and Sylhet district, while in Meghalaya state, India they settled in the foothills and inter-mountain valleys of the Jainta and Khasi Hills.

The Khasi community predominantly resides in forests, with much of their land leased from the Government of Bangladesh. Typically, these leases allow the use of forested land for 99 years, particularly in the uphill areas conducive to betel leaf farming. Successful farming here relies on sufficient daylight, rainfall, shade, and suitable environmental conditions. Their land-use strategy involves cultivating trees within homesteads and uphill fields. The Khasi lifestyle revolves around a tree-crop agricultural economy, avoiding practices like *jum* or slash-and-burn agriculture. Due to the challenging terrain of their habitat, plow cultivation is impractical, leading them to rely on shifting cultivation. Betel leaf stands as their primary crop, shaping the cluster of their houses known as *panpunji*. Unlike the *paner boroj* of the plains, Khasis apply natural shade from plentiful green trees instead of artificial support for their betel creepers. This balanced agricultural system stems from core Khasi indigenous knowledge (Jhuma and Hussain 2022). However, climate change has brought prolonged heat, reduced rainfall, and increased dense fog, adversely affecting the environment necessary for betel leaf cultivation. Similar to other ethnic communities, the Khasi people face threats to their livelihood, culture, and existence due to the encroachment of the majority Bengali community (Singha 2014:9-10). The Northeastern region of Bangladesh heavily relies on the Khasi inhabitants, who both cultivate and protect the hills. Despite their legal rights to government land, they encounter challenges from the forest department and local troublemakers (Patam 2005:184-85).

James C. Scott (1998) identified the ongoing tensions between mobile, slash-and-burn hill peoples and wet-rice valley kingdoms, questioning the

established regional geography. He noted that nomads, pastoralists, hunter-gatherers, Gypsies, vagrants, homeless individuals, itinerants, runaways, slaves, and serfs have consistently posed challenges to states. The sedentarization of these mobile groups appeared to be a perennial state project that rarely succeeded. Scott examined these efforts as attempts to create a legible society, simplifying classic state functions such as traditional taxation and enlistment procedures to prevent insurgencies. These issues have been identified as a central problem in statecraft, pointing out that the premodern state had a limited understanding of wealth, landholdings, yields, location, and, crucially, the identity of its subjects. The Khasis, like other indigenous groups in Bangladesh, have encountered significant challenges in safeguarding their ancestral lands. Land grabbing remains a widespread issue in Bangladesh. For the Khasis, the land holds deep spiritual and religious significance, forming the foundation of their existence despite minimal legal protection. Although the Khasis have utilized these lands for generations, the absence of updated legal documentation leaves them vulnerable to exploitation by mainstream institutions and individuals who resort to filing false allegations or causing damage to the betel leaf farms to acquire the land forcibly. Despite the haunting memory of the Magurchara tragedy in Kamalganj Upazila, Maulvibazar district, the states imposition of projects like eco-parks and other infrastructure has intruded upon Khasi lands. The crucial legal safeguards for protection, guaranteed in the CHT (Chittagong Hill Tracts), have been revoked, and official compliance in the plains remains lacking.

The Bengalis establish the vast majority in Bangladesh, coexisting with various non-Bengali indigenous communities. Presently, ethnic minorities make up around one percent (1%) of the country's 165 million people (BBS 2022). Despite this, constitution of Bangladesh does not officially recognize these ethnic minorities as indigenous people. Instead, it classifies them as 'minor races', 'ethnic sects', 'tribes', and 'communities' (See The Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Article 23/A, and van Schendel and Bal 2002:124). This inconsistent labeling of ethnic minorities-referenced as *Tribes*, *Upojati*, *Adivasi*, *Khudronrigoshthi*, and Indigenous people has not inherently changed their academic, socio-economic, or political standing or altered their daily interactions with the majority population. Within Bangladesh, the Khasis encounter significant challenges, including human-made environmental hardships, uncertainty of land ownership, and overall insecurity. Consequently, the Khasis find themselves marginalized from every aspect of social, economic, and cultural activities of the state. In response, many among them are relocating internally or abroad; both religious minorities and ethnic

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

communities are constantly migrating to nearby urban centers or even across national borders.

In the past, the Khasi and Jaintia Hills and surrounding hilly territory remained undivided, and native Khasis moved around these hilly landscapes for betel leaf cultivation. Over the years long-term cultivation caused a reduction in soil fertility, consequently, betel leaf farmers relocated their settlements. However, mobility faced barriers due to partition or institutional constraints, and internal and external movement persisted within the national territory and between the Khasi-Garo Hills of Meghalaya and Bangladesh, surpassing geo-political boundaries. Bangladeshi Khasi boys and girls receive education through kinship relations in Meghalaya, India. Cross-border movements are integral to their daily lives, showing how the Khasis across borders interact and navigate through their shared ethnic identity. This cross-border movement embodies a crucial aspect of transnationality (Faist 2013), signifying the segments of migrant lives occurring across state borders. S. Vertovec (1999, 2007) observed these practices as deeply entrenched, contributing to the formation of a transnational field that links places across multiple nation-states and connects both mobile and immobile individuals within these locations. Recent studies (Sur 2021) have shown how indigeneity, gender, and religious identity intersect to facilitate border crossings for Garo Christian women between Bangladesh and India. It reminds us that while this border is becoming increasingly fatal, it remains fundamentally a space of mobility. This highlights the dual imperatives of containment through border infrastructures and mobility driven by poverty, desperation, and kinship, which continually shape the uncertain and shifting landscapes of borders (Sur 2021). In the age of technological advancement, Khasis in Bangladesh now have the opportunity connecting with their relations in Meghalaya, India. This connectivity has significantly influenced the lives and evolution of the Khasi community across borders, facilitated by various social networking sites. The processes of defining borders, cross-border mobility, and their impacts on nations and societies are especially significant, particularly for indigenous minority groups and borderlands, representing a fertile ground for contemporary research.

b. Ethnicity and the Sense of Belonging

The concept of belongingness summarizes both an emotional connection and recognition within a specific social group. Understanding the dynamics of inclusion and exclusion involves dealing with various complexities and hurdles inherent in the notion of belonging. Nira Yuval-Davis (2006:199) outlines belongingness into three core facets: i) social locations, ii) identification and

emotional bonds, and iii) ethical and political principles. Social location, including race, class, and gender, assumes diverse significance across various geographical and historical contexts due to the fluctuating nature of power dynamics across different times and spaces. Sense of belonging involves narratives that depict emotional connections and affiliations of an individual with where they feel they fit or do not. The concept of social location highlights attitudes toward belonging intertwined with ethical and political values. Whether recognized by others or self-identified, belonging fundamentally denotes being a part of something larger.

Those mechanisms and processes that are active behind and construct belonging have created politics of belonging. This highlights that belonging is not solely determined by an individual's desire; instead, it is influenced by decisions made about where and with whom one fits in or is excluded. The way inclusion and exclusion work, along with the expectations and conditions set, are all results of the politics of belonging.

The feeling of belonging is more rooted in emotions and perceptions rather than being an explicitly defined, individual matter. Therefore, comprehending human being's sense of belonging is complex as it is interconnected, influencing, and have been influenced by various factors. In the context of this study, the concept of belonging has been employed to explore how the sense of belonging of the Khasis has shaped their connection to their indigenous identity amidst different patterns of movement and migration. Both internal dynamics and external influences are contributing to the changes in the survival strategy of the Khasis in Bangladesh. It shows how the Khasis navigate their interactions among various groups, such as the *Punji* inhabitants, migrant settlers, affluent betel farm owners, and marginalized betel farmers, as well as their relationships with neighboring Bengalis in the course of mobility practices. Additionally, it aims to shed light on the traditional roles of women within the community, which are deeply intertwined with their traditional beliefs and adage. Despite this, the manifestations of the matrilineal system and roles of women states diverse patterns. The expectations and experiences of belongingness associated with the complex and coexisting practice of the Khasi social formation so as being an indigenous group of Bangladesh.

3. Conclusion

This article has discussed the theoretical argument based on the mobility and sense of belonging of the Khasis of the northeastern part of Bangladesh, who have intricately intertwined with their traditional ways of livelihood pattern,

characterized by mobility and immobility between their homesteads, known as *Punji*, and other surrounding locations. This mobility experiences gives rise to diverse narratives and encounters, revealing the challenges and interactions faced by the Khasi community. Varied patterns of movement stem from traditional subsistence practices and established networks of mobility, contributing to the uncertainties faced by indigenous ethnic groups in Bangladesh. These dynamics shape both the mobility and immobility experienced by the Khasis, influencing contemporary migration aspirations and reflecting underlying religious reforms. Through their traditional practices, the Khasis redefine immobility, highlighting the complex interplay between mobility patterns and the rootedness they feel in their indigenous heritage juxtaposed with their national identity. The mobility of the Khasis unveils power dynamics between the majority and minority groups, illustrating the deliberate marginalization and the persistent struggle of minorities against structural inequalities through their narrative of belongingness. Furthermore, the theoretical understandings of mobility studies engender new gender perspectives among the Khasis, fostering a profound sense of belonging amidst evolving socio-economic circumstances.

References

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*: *Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.* London and New York: Verso.

Arango, J. (2004). Theories of International Migration. In *International Migration in the New Millennium: Global Movement and Settlement*, pp. 15-35, D. Joly (ed.), Aldershot: Ashgate.

Ball, E. (2007). *They Ask if We Eat Frogs: Garo Ethnicity in Bangladesh*. Singapore: ISEAS Publishing.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). *The Bangladesh Statistical Yearbook 2022*. www.bbs.gov.bd [Accessed in 12 February 2023]

Bareh, H. (1967). The History and Culture of the Khasi People. Guahati: Spectrum Publications.

Barth, F. (1969). Introduction. In *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference*, F. Barth (ed.), Oslo: Universitetsforlaget.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, J. Richardson (ed.), pp. 241-258, New York: Greenwood.

Brightbill, J.; Amy, K. and Seung, K. (2007). The War-Jaintia in Bangladesh: A Sociolinguistic Survey. In *Journal of Language Survey Reports*, SIL International Publication. https://www.sil.org/resources/publications/entry/9059 [Accessed in 21 November 2019]

Bucher, M. and Urry, J. (2009). Mobile Methods and the Empirical. In *European Journal of Social Theory*, Vol. 12, pp. 99-116.

Castle, S. and Miller, M. J. (2009). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (4th edition). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Chatterji, S. K. (1928*). Kirata-Jana-Krti: The Indo-Mongoloid and their Contribution to the History and Culture of India*. Calcutta: The Asiatic Society.

Chowdhury, P. K. (2016). *A Study on Socio-economic condition and Livelihood of Khasi Community and Development of Ethnic Tourism in Khasi Punjis of Kamalganj Upazila, Moulvibazar District*. PhD dissertation. Department of Archaeology, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

Cresswell, T. (2010). Towards a Politics of Mobility. In *Environment and Planning D: Society and Space, Sage Journals*, Vol. 28, pp. 17-31.

Eriksen, T. H. (2005). Economics of Ethnicity. In *A Handbook of Economic Anthropology*, James G. Carrier (ed.), pp. 353-369, UK: Edward Elgar Publication Limited.

Faist, T. (2013). The Mobility Turn: A New Paradigm for the Social Science? In *Ethnic and Racial Studies,* Vol. 36, Issue 11, pp. 1637-46.

Geertz, C. (1963). "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Politics in the New States. In *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, pp. 105–57, Clifford Geertz (eds), New York: Free Press of Glencoe.

Gurdon, P. R. T. (1914). *The Khasis*. London: Government of Eastern Bengal and Assam.

Hussain, Z. (1991). Who are the Prehistoric Dwellers of Meghalaya Plateau? In *Archaeology of North-eastern India*, J. P. Singh and G. S. Gupta (eds.), New Delhi: Har-Anand Publication.

Jhuma, C. F. and Hussain, A. (2022). Envionment and Social System in the Context of Small-scale Societies. In *Contemporary Issues in Social Science,* pp. 233-256, Faculty of Social Sciences, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

King, R. and Skeldon, R. (2010). Mind the gap! Integrating approaches to internal and international migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, Issue 10, pp. 1619-46.

Massey, D.S.; Arango, J.; Hugo, G.; Kouaouci, A.; Pellegrino, A. and Edward Tylor, J. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. In *Population and Development Review*. Vol. 19, Issue 3, pp. 431-466.

Nash, M. (1996). The Core Elements of Ethnicity. In *Ethnicity*, J. Hutchinson and A. D. Smith (eds), pp. 24-28, Oxford: Oxford University Press.

O'Reilly, K. (2015). Migration Theories: A Critical Overview. In *Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies,* Anna Triandafyllidou (ed.), pp. 25-33, Oxford: Routledge.

Patam, R. (2005). *Khasiader Itihash Oitijjo o Sonskriti*- in Bengali (*The Khasi Peoples: History, Heritage and Culture*). Dhaka: Silvanus Lamin.

Portes, A. and Walton, J. (1981). *Labor, class and the international system*. London: Academic Press.

Salazar, N. B. (2019). Theorizing Mobility through Concepts and Figures. In *Tempo Social*, Vol. 30, Issue 2, pp. 153-168. https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2018.142112 [Accessed in 11 May 2021]

Salazar, N. B. and Smart, A. (2011). Introduction: Anthropological Takes on (im)mobility. In *Identities: Global Studies in Culture and Power*, Vol. 18, Issue 6, pp. i-ix. https://doi.org/10.1080/1070289X.2012.683674 [Accessed in 25 May 2020]

Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State. Yale University Press.

Sheller, N. G. and Salazar, N. B. (2013). Regimes of Mobility Across the Globe. In Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 39, Issue 2, pp. 183-200. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2013.723253 [Accessed in 1st August 2020]

Singha, R. (2014). Kinship and Marriage System among the Khasis of Bangladesh: A Study of Khasi Culture and Identity. In *The Bangladesh Development Research Working Paper Series*. http://www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.2519078 [Accessed in 1st August 2020]

Siraj, N. and Bal, E. (2017). 'Hunger has Brought us into this Jungle': Understanding Mobility and Immobility of Bengali Immigrants in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. In *Social Identities*, Vol. 23, Issue 4, pp. 396-412.

Sur, M. (2021) *Jungle Passports: Fences, Mobility, and Citizenship at the Northeast India-Bangladesh Border.* Philadelphia: University of Philadelphia Press.

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Article 23/A. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ [Accessed in 16 August 2020]

van Schendel, W. (1992). The Invention of the 'Jummas': State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh. In Modern Asian Studies, Vol. 26, Issue 1, pp. 95-128.

van Schendel, W. (2001). Working Through Partion: Making a Living in the Bengal Borderlands. *International Instituut Voor Geschiedenis*, Vol. 46, pp. 393-421.

van Schendel, W. and Bal E. (2002). Beyond the "Tribal" Mind-set: Studying Non-Bangali Peoples in Bangladesh and West Bengal. In *Contemporary Society: Tribal Studies*, G. Pfeffer and D. K. Behera (eds.), Vol. 5, pp. 121-138, New Delhi: Concept Publishing Company.

Vertovec, S. (1999). Conceiving and Researching Transnationalism. In *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 22, Issue 2, pp. 447-462.

Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its Implications. In *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 30, Issue 6, pp.1024-1054.

Wallerstein, I. M. (1974). *The Modern World System*. London: Academic Press.

Yuval-Davis, N. (2006). Belonging and the Politics of Belonging. In *Patterns of Prejudice (Boundaries, Identities and Borders: Exploring the Cultural Production of Belonging),* Vol. 40, Issue 3, pp. 197-214

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

The Changing Landscape of Social Science Research at SUST in the Wake of Neoliberal Policy: Insights from Researchers

SV Anwar Ahmed[1] and AFM Zakaria[2]

Abstract

This qualitative study examines the impact of neoliberal educational policies on research priorities at Shahjalal University of Science and Technology (SUST), emphasizing the difficulties social sciences researchers face. The findings indicate a significant shift towards market-oriented, applied research driven by funding flows and constraints and incentives from bodies like the University Research Center (URC) and the University Grants Commission (UGC). These limitations force researchers to focus on immediate societal needs, sidelining pure academic inquiry. Insights from David Harvey, Theodore Porter, and Wendy Brown reveal how neoliberal frameworks commodify knowledge, shaping academic pursuits towards economic value (Harvey, 2005; Porter, 2012; Brown, 2015). The study introduces the concept of the "Vulnerable Academic Self," highlighting the precarious position of researchers burdened by financial constraints, heavy teaching loads, and administrative duties. Socio-economic barriers, including gender-related issues, exacerbate this vulnerability, hindering academic progression and fundamental research. The paper underscores the need for a supportive institutional framework that balances teaching and research, and values both applied and pure research. Reflecting on global trends, the paper calls for policies enabling scholars to pursue in-depth theoretical studies alongside applied research.

Introduction

> Neoliberalism……is not just a question of economy but a new form of civilization. The impossibility or lack of credibility of universal or world histories today is not advanced by some influential postmodern theory, but by the economic and social forces generally referred to as globalization and by the emergence of forms of knowledge that have been sublate rinsed under…… modern colonialisms and colonial modernities.
>
> (Mignolo, 2012, p. 22)

The research priorities at Shahjalal University of Science and Technology (SUST) have increasingly been shaped by neoliberal policies that emphasize market-oriented and outcome-based education, mirroring global academic trends. This shift, characterized by a preference for applied research with

[1] Independent researcher. Email: anwarahmedsust@gmail.com
[2] Professor of Anthropology at Shahjlalal University of Science and Technology (SUST), Sylhet, Bangladesh. Email: zakaria-anp@sust.edu

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

immediate societal impact, often sidelines pure academic inquiries. David Harvey's concept of neoliberalism, which underscores profit maximization and competition, is evident in this context, as the prioritization of research projects aligns closely with market demands and economic benefits (Harvey, 2005; Brown, 2015). Funding bodies such as the University Research Center (URC) and the University Grants Commission (UGC) further steer research towards applied projects through their constrained grant allocations and short project durations, which limit the feasibility of conducting in-depth, fundamental research. As Porter (2012) and Brown (2015) argue, neoliberal frameworks commodify knowledge, thereby shaping academic pursuits to meet economic imperatives rather than intellectual curiosity. This market-driven orientation is reinforced by performance metrics and institutional pressures that prioritize high publication volumes and citation counts, a phenomenon highlighted by scholars such as Michael Apple and Simon Marginson. These metrics, while intended to enhance academic accountability, often divert focus from meaningful, long-term knowledge creation to short-term, quantifiable outputs (Apple, 2001; Marginson, 2006).

Consequently, researchers at SUST often align their work with available funding opportunities, reflecting broader trends within global academia where economic value dictates research priorities. The concept of the "Vulnerable Academic Self" emerges as researchers navigates this challenging environment. Neoliberal policies have led to reduced public funding for higher education, resulting in significant financial constraints on researchers. These constraints are compounded by heavy teaching loads and administrative duties, which further limit the time and resources available for conducting pure academic research (Slaughter & Rhoades, 2004). This creates a state of academic vulnerability where researchers struggle to balance their dual roles effectively (Kezar & Sam, 2010).

Moreover, socio-economic barriers, including gender-related issues, exacerbate these difficulties, adding another layer of complexity to the academic landscape at SUST. The cumulative effect of these challenges underscores the need for a more supportive institutional framework that values both applied and fundamental research. Without such support, the capacity for groundbreaking, theoretical advancements in the social sciences remains significantly hampered (Harvey, 2005; Brown, 2015). Addressing these structural and policy-induced challenges is crucial for fostering a balanced and robust academic environment at SUST. Such an environment should equally value immediate societal impact and the intrinsic worth of pure academic

research, thereby enabling scholars to contribute meaningfully to both short-term applications and long-term intellectual advancements.

Methodology

This study employs a qualitative research design to investigate the impact of neoliberal policies on social science research at Shahjalal University of Science and Technology (SUST). The qualitative approach was chosen to gain in-depth insights into the experiences and perceptions of researchers within this academic environment. We conducted 21 interviews of the informants to conduct the research. In this research, we have incorporated participants from Shahjalal University of Science and Technology (SUST) social science faculty who are actively involved in academic activities and research and pursuit diverse disciplines and different career paths, ensuring a wide representation of experiences. Social Science's journal editor of SUST, the director of SUST Research Center, and the director of Institute for Quality Assurance Cell (IQAC) were also key informants as they have an active connection with the social science research culture at SUST. The rationale for selecting these participants was underscored by their experiences and insights related to the impact of neoliberal ideologies and values.

Data was collected through interviews conducted over a two-month period. Each interview lasted approximately one hour and was conducted in a quiet, private setting to ensure confidentiality. The interview guidelines included open-ended questions designed to explore participants' experiences with research funding, teaching loads, the pressures of conducting market-oriented research and others. We conducted two types of interviews—In-Depth Interviews (IDIs) and Key Informant Interviews (KIIs)—and analyzed policy documents from various bodies, along with both published and unpublished research materials. Interviews were audio-recorded and transcribed verbatim. Thematic analysis was used to identify and interpret key themes related to the impact of neoliberal policies on research practices. Transcripts were coded manually, and recurring patterns were identified through an iterative process.

Informed consent was obtained from all participants, ensuring they were aware of the study's purpose and their right to withdraw at any time. Pseudonyms were used to protect participants' identities, and all data were stored securely. The study's findings where the reliance on self-reported data may introduce bias. Future research might include quantitative methods to see the overall horizon of research culture and validate the findings on a cross-faculty basis.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Critical Examination of Published and Unpublished Research

Selection and Prioritization of Research Issues

Scholars worldwide highlight the impact of neoliberal policies on research themes and knowledge production in academia. David Harvey discusses how neoliberalism influences various societal aspects, including higher education, by prioritizing market-oriented values and competition (Harvey, 2005). A point raised by one of our participants is as follows:

> There's a clear pattern when you look at the research landscape here. Many of us, me included, gravitate towards applied research. It's not just about personal interest; it's about sustainability and relevance. Take climate change, for instance; it's a pressing issue, and research in this area tends to attract funding more readily.

In Bangladesh, this can lead public universities to focus on research with immediate economic value, overshadowing broader societal concerns. Theodore Porter explores how academic matrices and quantification favor research with high citation potential or measurable impacts, affecting research diversity and inclusivity (Porter, 2012). Wendy Brown examines the commodification of knowledge in neoliberal universities, where market-driven research themes are prioritized, influencing researchers' identities and aspirations (Brown, 2015). One interviewee noted:

> If you glance at the recent publications and ongoing projects, you'll notice a strong inclination towards applied themes. It's not surprising considering the funding landscape. Projects related to maternal health or public health, for example, receive more attention because they are not only academically significant but also address societal concerns.

The analysis of both archival records, based on published and unpublished works, and recent interviews with members of the School of Social Science at Shahjalal University of Science and Technology (SUST) has brought to light a distinct and enduring trend—research endeavors predominantly lean towards applied research. This pattern manifests through a purposeful selection and prioritization of research topics aligned with market demands and funding availability. Noteworthy research focuses on critical areas such as climate change, environmental issues, maternal health, public health, child health, and the Rohingya crisis. As a faculty member explained:

> I've been here for a few years now, and the trend has been consistent. The available funding often guides our research choices. It's challenging to prioritize topics solely

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

> based on academic curiosity when there are pressing issues like the Rohingya crisis that demand attention and, coincidentally, attract resources.

The statements, from the participants, and historical records underscore the pervasive influence of applied research in shaping the preferences of researchers within SUST's School of Social Science. The alignment of research topics with societal needs and funding opportunities reflects a pragmatic approach that harmonizes academic exploration with real-world impact. The ongoing prevalence of such trends suggests an intricate interplay between academic pursuits and external factors influencing research agendas.

Research Funding Sources

The exploration of archival data and recent interviews with participants in SUST reveals a multifaceted spectrum of research funding sources. Primary channels identified by participants include the University Research Center (URC), the University Grants Commission (UGC), and external sources such as private entities like industries, non-government bodies, and NGOs. Notably, participants recognize a nuanced interplay between funding sources and the nature of research pursuits, with specific conditions set by URC and UGC exerting influence on the research agenda. During an interview, a researcher noted:

> For my last project, I secured funding from the University Research Center (URC). They do support research, but the conditions are pretty clear. It needs to be outcome-based, applied research, and the results must be published in reputed journals. It's a bit limiting if your interests lie in more exploratory or theoretical research, but it ensures a certain level of impact.Another researcher noted, I've explored various funding options, including self-funding and tapping into private resources like NGOs. However, there's a noticeable trend - URC and UGC remain dominant. They come with conditions, sure, but those conditions often guide us towards research that has tangible outcomes. It might be a bit restrictive at times, but it's in sync with the trend of prioritizing applied research.

These remarks highlight the pivotal role of URC, UGC, and external funding in guiding the research trajectory at SUST. While participants recognize constraints set by institutional funding bodies, there is a prevailing consensus favoring the prioritization of outcome-based and applied research with a focus on societal impact. This funding dynamic emerges as a decisive force shaping both research priorities and methodologies within Social Science School at SUST. The following table summarizes the key research funding sources identified through archival data and participant interviews at SUST. It highlights the role of institutional and external funding sources and their impact on research direction and methodology.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Table 1 Participant's funding sources and their types

Funding Source	Type	Remarks/Conditions
University Research Center (URC)	Institutional	Supports applied, outcome-based research. Requires publication in reputed journals. Limits theoretical/exploratory research.
University Grants Commission (UGC)	Institutional	Dominant source with focus on tangible outcomes. Encourages applied research.
Private Entities (e.g., industries)	External	Occasionally used. Conditions may vary.
Non-Government Organizations (NGOs)	External	Used occasionally. Flexible but less dominant.
Self-Funding	Individual	Explored by researchers as a flexible alternative.

Aihwa Ong, a prominent anthropologist, contends that neoliberalism influences subjectivity by shaping individuals' aspirations and desires within the context of global capitalism. Neoliberal subjectivities tend to embrace entrepreneurial values and emphasize self-optimization to thrive in the competitive market-oriented society. When it comes to research funding sources, this transformation in subjectivity plays a pivotal role. Funding opportunities that reward market-driven research outcomes and commercialization initiatives align with the ethos of entrepreneurial subjectivity. Researchers, driven by the pressure to secure funding and meet market demands, may prioritize projects that promise immediate economic value over research that addresses broader societal concerns (Ong, 2006). Similarly, Judith Butler's work on performativity in the context of neoliberalism accentuates how subjectivity is produced through repeated performances of social norms. In the realm of research funding, this performance-based subjectivity may translate into researchers conforming to funding agencies' expectations and priorities. Funding bodies, influenced by neoliberal policies, may favor research projects that align with market interests, further shaping researchers' subjectivities to reassure and fit within the mold of the market-driven scholar rather than to become a scholar of a different one (Butler, 1990).

Neoliberal policies and funding structures contribute to the rise of entrepreneurial subjectivities among researchers as they navigate a fiercely competitive research environment. Public universities, constrained by limited government funding and increasing financial pressures, may become more

reliant on private industry partnerships to sustain research activities. Therefore, researchers may face the imperative to align their research with industry priorities and commercialize their work to secure private funding. The relationship between research funding sources and neoliberal ideologies is particularly pronounced in public universities in Bangladesh. The shift towards increased reliance on external funding sources, both from industry and international agencies, may exert a significant influence on research culture. Commercialization of research outputs becomes a strategy for financial sustainability and survival, leading to a transformation of researchers' identities and aspirations within the academic landscape. Neoliberal ideologies reinforce and legitimize the market-driven approach to knowledge production and dissemination. Funding opportunities that prioritize market value and commercialization align with the entrepreneurial subjectivities promoted by neoliberalism. This alignment influences research priorities, the type of knowledge produced, and the overall direction of research in social sciences at SUST.

Drivers of Research: Internal Dynamics and External Forces

Neoliberal Ideologies and the Policies

According to David Harvey's conceptualization, neoliberalism is an economic and political ideology that emphasizes individual self-interest, free-market capitalism, and less government regulation. It promotes deregulation, and privatization, in order to create a competitive atmosphere that places an emphasis on maximizing profits and stimulating the economy (Harvey, 2005). Neoliberal philosophies have become powerful forces influencing many facets of higher education around the world. We conducted interviews with researchers in SUST's Social Science faculty, concentrating on the sub-theme 'Neoliberal Ideologies and Policies.' Additionally, we systematically examined key educational policies in Bangladesh, such as the National Education Policy (NEP) 2011, Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP), National Skills Development Policy (NSDP) 2011, and Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT). Additionally, we scrutinized the guiding principles of SUST's Institute for Quality Assurance Cell (IQAC) and University Research Center (URC). Concurrently, an exploration of the funding conditions and principles articulated by the University Grants Commission (UGC), influenced by the philosophy of the World Bank, revealed a clear connection with neoliberal ideologies and their associated policies. The impact of these ideologies on the educational and research agenda is evident both globally and locally. Our empirical analysis highlights a

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

noticeable influence on social science researchers at SUST, stemming from internal factors such as URC, IQAC, and departmental philosophies, as well as external factors including UGC, HEQEP, HEAT, and the overarching influence of the World Bank. While participants acknowledge the presence of neoliberal ideologies and their mechanisms in the social science research environment at SUST, they observe that the extent is not as extensive as in Western countries with robust university-industry collaborations and industry-funded project-based research. Nevertheless, there is a gradual and continual influx of neoliberal influences, evident in the evolving research culture, increasing university-industry collaborations, and the infiltration of outcome-based educational and research philosophies aligned with the national development agenda.

However, scholars globally provide insights into this relationship, showing how these policies and documents shape academia and researchers' experiences. Michael Apple emphasizes that neoliberal education policies prioritize market-driven values and competition, affecting funding priorities and research agendas (Apple, 2001). Simon Marginson notes that international agreements and funding guidelines can influence research priorities and collaborations, encouraging alignment with global trends and funding opportunities (Marginson, 2016). Additionally, education scholars highlight how neoliberal audit cultures push for performance-based evaluations and accountability, promoting research metrics and quantifiable indicators to assess academic productivity. Discussing the research landscape, another interviewee mentioned:

> Neoliberal ideas influence our national development philosophy itself. The shift towards— outcome-based education and research is a testament to that. While it adds practicality, — there's a need to balance it with the core principles of academic exploration and knowledge creation.

The above statements of participants and overall discussion describe a complex and nuanced relationship between neoliberal ideologies and the social science research environment at SUST.

Research Metric

Steven Shapin, a historian and sociologist of science, highlights how research metrics, such as citation counts and journal impact factors, have become central in evaluating academic productivity and success. In the context of neoliberalism, universities are increasingly adopting performance-based evaluation systems, where researchers are incentivized to focus on producing

outputs that garner high citation counts or are published in prestigious journals. This emphasis on quantitative metrics is influencing researchers' subjectivities and aspirations, as they strive to meet the metrics-driven criteria for academic success (Shapin, 2008). One researcher commented:

> I see the metrics-driven approach positively. In the real world, impact matters, and these metrics are indicators of the impact our research is making. It aligns with the pragmatic side of academia, where tangible outcomes are valued.

An insightful observation, however, from a participant was, there's a danger in the overemphasis on metrics. It creates a culture where researchers may prioritize the 'popular' topics over the truly meaningful ones. We need to question whether the pursuit of high impact factors aligns with the broader goals of academia. Furthermore, Michael Power, a sociologist and organizational theorist, delves into the concept of audit cultures and the increasing emphasis on accountability in higher education. Neoliberal policies are also promoting the audit of research outputs, where universities and researchers are subject to evaluations based on quantifiable metrics. This audit culture can shape researchers' subjectivities, as they may internalize the pressure to produce outputs that align with the metrics-driven criteria of success and accountability (Power, 1999). Data analysis from historical records and insights derived from recent interviews with participants of Social Science School exposes a predominant focus on research metrics as fundamental yardsticks for academic achievement. Universally recognized among participants is the importance of publishing in esteemed journals, attaining substantial citation counts, and securing high impact factors, all of which are deemed pivotal in shaping their academic trajectories.

Nevertheless, this culture centered on metrics elicits diverse responses, as some researchers perceive it as a pragmatic approach aligning with the demands of academia, while others criticize its potential impact on the fundamental values inherent in research. While acknowledged for driving academic success, there is an underlying concern that this emphasis may divert attention from the core purpose of research: generating valuable knowledge for the betterment of society. This dual perspective underscores the complex interplay between academic metrics and the broader societal impact of research within the school. As one professor stated in our interviews:

> I value impact, but let's not forget why we're in academia. The main focus should be on creating knowledge, contributing to our fields, and making a difference. Citation counts and prestigious journals are just byproducts of meaningful research, not the ultimate goals.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Ambition and Identity: Crafting a Career in Research
Personal Motivations and Career Trajectories

Our research findings shed light on the significant influence of personal motivations and career trajectories on the culture of research and knowledge production among social science researchers at SUST. Participants articulated that a notable proportion of researchers are primarily driven by the pursuit of academic promotion, a phenomenon aptly termed as "promotion-based research". One interviewee noted:

> There's a clear trend of promotion-based research here. Many are solely motivated by the need to enhance their academic profile for career progression. Many are just meeting the number of publications only for their promotion.Their primary focus is on enhancing their academic profiles by generating a high volume of papers, guided by career-centric and personal motivations.

Some researchers actively prioritize the accumulation of citation counts. An important point raised by a professor was:

> The academic culture here is increasingly focused on quantity rather than quality. Researchers are driven by the need to accumulate publications for promotion. It's not inherently wrong, but when it becomes the primary motive, it raises questions about the integrity of our academic pursuits.

While this pursuit aligns with the pragmatism of Academic Capitalism, where metrics play a crucial role, it raises concerns, especially within the context of a publicly funded university. When academic promotion becomes the predominant objective, it introduces problematic implications from various perspectives. This approach challenges a foundational principle of academia, asserting that research should transcend individual aspirations and instead aim for the betterment of society. Genuine scholarly endeavors are expected to contribute meaningfully to specific knowledge domains and foster value within the academic community, society, and culture at large. Neoliberal discourses expect employees to meet ever-increasing demands, perpetuating a cycle of striving for an unattainable ideal (Davies and Peterson, 2005a; Costea et al., 2012). Academics, driven by career ambitions, often become complicit in their own subjection, shaping their potential and crafting preferred versions of themselves (Foucault, 1979; Gergen, 1992). A researcher stated:

> In an era of academic capitalism, it's natural to pursue promotion-driven research. However, we need to be cautious not to sacrifice the true essence of research—its impact on society and its role in advancing knowledge—for the sake of personal career trajectories.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Governmentality involves both control and self-regulation, where individuals continuously work on self-improvement and identity presentation (Foucault, 1982; Goffman, 1959). The focus on research over teaching is partly due to the measurable status of publications, influenced by managerial regimes' emphasis on rankings (Lynch, 2014). While participants acknowledge the realities of "academic capitalism", there is a shared concern that an excessive emphasis on numerical metrics may jeopardize the fundamental principles of meaningful research—contributing to knowledge enrichment and societal betterment.

Institutional Reward and Recognition

Both our archival study and participants' statements reveal a clear correlation between research priorities and the careers, aspirations, and identities of social science researchers at SUST. Many researchers align their research priorities with the goals and strategic focus areas of the university, often linked to institutional priorities. One faculty mentioned:

> I've seen colleagues adjusting their research themes to match strategic areas that attract grants. It's a pragmatic approach, as successful grant acquisition is acknowledged and rewarded within the institution.

This strategic alignment enhances the likelihood of receiving institutional support, recognition, and awards. Fellowships often require a demonstrated commitment to specific themes or innovative approaches, influencing researchers to shape their priorities accordingly. Promotion criteria, especially for advancement to higher academic ranks, also play a role in shaping research priorities and identities. Many researchers adjust their research priorities to align with the criteria for specific awards, such as the Dean's Award or Vice Chancellor Award. In the words of one faculty:

> Institutional awards and recognition play a significant role in shaping research priorities. Many researchers, including myself, consider them as sources of motivation. The criteria for promotions and awards guide our research choices and career aspirations.

According to participants' statements, not all researchers seek such awards and recognition; some engage in research without expecting such rewards.
However, a majority of researchers view institutional rewards and recognition positively as a source of motivation, giving meaning to their works.

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Pure Academic Research: Navigating Independent Spaces

Structural Incentives

At SUST, particularly within the social sciences research environment, participants express a noticeable absence of systematic support for those interested in engaging in pure academic research. Challenges highlighted include a lack of institutional and structural support for individuals aspiring to actively pursue basic or pure research. Participants note the scarcity of dedicated spaces for pure research activities, pointing to academic pressures such as managing class performance, handling multiple courses in a semester, and fulfilling the demands of exam evaluation and result processing. One participant stated:

> To actively engage in basic research, we need substantial academic and structural support. However, the reality is, there's minimal space for pure research amidst the academic pressures we face, such as multiple courses and the rush to complete the semester.

Balancing the dual priorities of conducting research alongside semester courses and other responsibilities is considered practically unattainable within the existing system. Respondents stress the need for a choice between the two, emphasizing the urgency to complete semesters and deliver results. In this context, participants disclose limited opportunities for involvement in basic research, noting that the rush to complete semesters leaves little room for in-depth exploration. One interviewee noted:

> Balancing the priorities of research alongside semester courses and other responsibilities is virtually impossible. SUST demands a choice between the two, and the institution does not provide the necessary structural support for us to excel in both areas.

Another participant laments the absence of funding for theoretical research from the University Research Center (URC) at SUST, prompting occasional self-funding for research aligned with their interests. It is observed that SUST, as an institution, does not structurally value fundamental research for its long-term academic impact. The participant shared the thoughts, that structurally, there's no encouragement for pure academic research. The absence of funds for theoretical research from the University Research Center adds to the challenge. It forces researchers to resort to self-funding.

This tendency is seen as indicative of social science research at SUST being shaped by applied values closely associated with neoliberal market values. On the topic of research direction, one interviewee shared, that as there are no explicit structural restrictions on pure research, the prevailing trend is towards applied and purpose-oriented research. SUST, structurally, does not prioritize fundamental research for long-term academic impact, aligning with the applied value linked to neoliberal market principles.

The influence of outcome-based education principles, embraced by SUST authorities, is acknowledged, further contributing to the prevailing emphasis on applied research. However, some exceptional researchers independently manage to pursue pure or fundamental research, occasionally securing funding from private sources. This representation underscores the apparent absence of structural spaces and opportunities that actively promote and support pure academic research within the social sciences at SUST. The research landscape is characterized by insufficient structural support and a preference for applied research in accordance with neoliberal principles. This trend is observed not only at SUST but also in other global contexts where universities prioritize research that promises immediate economic benefits.

Time and Budget Constraints

The essential components of time and budget play a pivotal role in the execution of pure academic research, particularly in the field of social sciences. Unfortunately, the University Research Center (URC) at SUST, alongside other pertinent departments and entities, encounters constraints in providing sufficient grants and time allocations for the pursuit of pure academic research. Participants in interviews highlighted the inherent difficulty of conducting foundational research when faced with limitations in both time and budget. During an interview a researcher noted, “URC's grant ceiling of 5-7 lakh taka and a maximum timeframe of 2 years severely restricts the feasibility of conducting profound basic research. The inherent focus of URC projects doesn't align with the requirements of pure academic research, hindering our ability to delve into fundamental social science inquiries.” In the domain of social science research, the significance of both time and budget is emphasized. The URC, as a specific department, currently offers a maximum grant of 5-7 lakh taka and a duration of up to two years for research projects. It is crucial to recognize that the project structure of URC is not primarily designed to support initiatives in basic research. This limitation is inherent, as the existing framework of URC projects does not align with the specific requirements and intricacies of pure academic research, presenting a challenge

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

for researchers aspiring to undertake fundamental studies in the field of social sciences. Illustrating the impact of funding on research direction, a researcher shared their insights, URC's project structure is not conducive to basic research. The allocated budget and timeframe are insufficient for the depth required in social science inquiries.

It poses a significant hurdle for researchers looking to contribute meaningfully to fundamental knowledge.The limitations in resources act as impediments to the depth and scope of social science inquiries, highlighting the necessity for a more supportive structural framework that enables researchers to contribute meaningfully to fundamental knowledge in their respective fields. Specifically in the social sciences, the impact of these constraints is profound. Researchers often require more time and flexible funding to explore theoretical frameworks and complex social phenomena. Marginson (2006) addresses the unique challenges faced by social science researchers in securing adequate resources and institutional support, arguing that the emphasis on applied research and short-term projects limits the scope and depth of social science inquiries.

"Vulnerable Academic Self"

The shift towards a neoliberal framework in higher education has introduced increased competition, performance evaluations, and market-oriented values, which significantly impact the academic self. Slaughter and Rhoades (2004) discuss how market forces shape academic work, prioritizing research with immediate economic returns over intellectual pursuits, thus marginalizing those who engage in pure academic research. One interviewee noted:

> Within SUST's social science research culture, the dichotomy between teaching obligations and research aspirations creates a challenging environment for scholars striving to fulfill both roles effectively.

The focus on career advancement and measurable outputs often leads academics to adopt a self-regulatory stance, aligning their identities with institutional expectations. Ball (2003) explores how performance metrics and managerial practices affect the self-perception and professional identities of educators, making them more vulnerable to external evaluations and less focused on intrinsic scholarly values. The pervasive audit culture in academia, characterized by constant evaluation and accountability measures, further exacerbates the vulnerability of academics. Strathern (2000) discusses how the emphasis on audits and performance reviews shapes academic work, leading to stress and a sense of inadequacy among scholars who struggle to meet these

standards. The rise of adjunct and contingent faculty positions has increased job insecurity, contributing to the vulnerable academic self. Kezar and Sam (2010) examine the impact of contingent labor on academic identity and stability, showing how precarious employment conditions undermine the sense of professional security and belonging.

In the context of the research culture within the social sciences at Shahjalal University of Science and Technology (SUST), scholars engaged in social science research exhibit a state of academic vulnerability, a construct herein termed as the "Vulnerable Academic Self". This kind of academic vulnerability emanates from various dimensions. Primarily, researchers contend with formidable constraints in both time and budgetary allocations, owing to a reduction in public funds for research in public universities. This financial limitation stems from the overarching principles and policies of Neoliberalism, influencing governmental disbursements. Academic vulnerability is further compounded by a dearth of institutional incentives conducive to concentrated research and robust academic engagement. The multifaceted responsibilities of teaching, fostering effective student interaction, organizing seminars, facilitating open discussions, and producing scholarly works often impede the researchers' ability to dedicate sufficient time and energy to basic and fundamental research endeavors. Respondents commonly perceive these challenges as impediments to active participation in research pursuits, diminishing academic enthusiasm. A researcher stated:

> In the realm of social sciences at SUST, academic vulnerability emerges as scholars grapple with constraints in time and budget, a consequence of reduced public funds under Neoliberal principles.

Despite the imperative to publish a substantial number of papers for academic promotion, researchers grapple with internal and external pressures, complicating their academic undertakings. Furthermore, economic considerations, including salary concerns and job security, emerge as noteworthy hindrances, discouraging full-fledged academic engagement in their research domains. A considerable segment of respondents faces socio-economic challenges, inclusive of gender and family-related barriers, which further encumber their academic progression within the prevailing institutional climate. The confluence of these challenges presents a dichotomy wherein researchers find themselves unable to execute both academic duties, such as classroom performance and examination evaluation, and substantive research activities with the desired efficacy. Consequently, the conceptualization of the

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

"Vulnerable Academic Self" encapsulates the intricate web of challenges and barriers that collectively impede scholars from fulfilling their academic roles and research aspirations in a satisfactory manner. The research culture within social sciences at SUST reflects a "Vulnerable Academic Self". Influenced by Neoliberal principles, scholars grapple with reduced public funds, time constraints, and a lack of institutional incentives. The multifaceted responsibilities of teaching and administrative duties impede dedicated research time, diminishing enthusiasm. Internal and external pressures for publication, coupled with economic concerns, hinder scholars' academic engagements. Socio-economic challenges, including gender-related barriers, further impede academic progression. This confluence creates a dichotomy, hindering scholars from effectively balancing classroom duties and substantive research activities. The "Vulnerable Academic Self" encapsulates these challenges, highlighting the obstacles that impede scholars from fulfilling academic roles and research aspirations satisfactorily.

A Case: Sudipta's Struggle for Balance

Sudipta (Pseudonym), a dedicated social science professor at Shahjalal University of Science and Technology (SUST), found herself caught in a relentless tug-of-war. Her passion for in-depth, fundamental research ("basic research") clashed with the ever-increasing demands of her teaching load and the pressure to conduct "market-oriented research". SUST's new emphasis on research often felt at odds with the realities of Sudipta's workday. Each semester, she tirelessly strived to deliver a comprehensive curriculum to her students. However, this commitment to quality teaching came at a cost. By the time she finished grading papers and preparing lectures, there was precious little energy or time left for her research endeavors.

The lack of dedicated time wasn't Sudipta's only obstacle. The University Research Center (URC) primarily offered grants for "market-oriented research" projects with immediate, practical applications. These projects often felt superficial compared to the theoretical and long-term inquiries that truly ignited Sudipta's intellectual fire. Sudipta yearned to delve deeper, to explore complex social phenomena without the constraints of immediate results. However, the lack of structural support and funding for "basic research" at SUST left her feeling disheartened. She struggled to reconcile her academic identity with the pressures to prioritize "marketable" research outcomes. This constant battle took a toll on Sudipta. The feeling of never being able to fully dedicate herself to either teaching or research left her in a state of "unexpected

complex academic situation." The joy of discovery, the very essence of academic life, began to fade.

Despite the challenges, Sudipta wasn't ready to surrender her passion. She continued to search for ways to bridge the gap between her love for fundamental research and the demands of the evolving system. Perhaps there were opportunities to incorporate elements of "basic research" within her teaching, or maybe collaborations with colleagues in applied fields could offer a bridge. Sudipta's story highlights the complex dilemma faced by many professors at SUST. It underscores the need for a more balanced research environment that recognizes the value of both fundamental and applied inquiries. Whether Sudipta can find a way to reconcile her passions and navigate the changing academic landscape remains to be seen. But her story serves as a potent reminder of the resilience and dedication that academics possess, even in the face of seemingly insurmountable challenges.

Conclusion

Research at Shahjalal University of Science and Technology (SUST) is heavily shaped by neoliberal policies, which prioritize market-oriented and outcome-based education. This environment favors applied research with immediate societal impact over pure academic inquiries, a trend driven by funding constraints from institutions like the University Research Center (URC) and University Grants Commission (UGC). Insights from theorists like David Harvey and Wendy Brown illustrate how neoliberalism commodifies knowledge, influencing researchers to align their work with market-driven projects. Researchers at SUST, facing limited institutional support and significant teaching and administrative burdens, struggle to balance these responsibilities with their research aspirations. The growing emphasis on research metrics such as citation counts—rooted in neoliberal models of performance evaluation, as critically examined by Michael Apple and Simon Marginson—has further exacerbated the issue. While research can address societal needs, the pressure for high publication volume for "promotion-based research" can raise concerns about the integrity and depth of knowledge creation. Consequently, the "Vulnerable Academic Self" emerges, reflecting the pressures of reduced funding, economic concerns, and socio-economic barriers. This state underscores the need for a supportive structure that allows scholars to effectively balance teaching and fundamental research. The alignment of research with neoliberal values and market demands at SUST is reflective of broader global academic trends, emphasizing the need for a

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

reconsideration of research priorities and support mechanisms within the institution.

Reference

Apple, M. W. (2001). Educating the "right" way: Markets, standards, God, and inequality. Routledge.

Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy, 18(2), 215-228.*

Brown, W. (2015). Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution. Harvard University Press.

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.

Davies B and Petersen EB (2005a) Neo-liberal discourse in the Academy: The forestalling of (collective) resistance. Learning and Technology in the Social Sciences 2(2): 77–97.

Foucault, M. (1979). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.

Foucault, M. (1982). The history of sexuality, vol. 1: An introduction. Random House.

Gergen, K. J. (1992). The saturated self: Dilemmas of identity in contemporary life. Basic Books.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Doubleday Anchor Books.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.

Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT) Project Ministry of Education & University Grants Commission. (2021). *Higher education acceleration and transformation (HEAT) project: Project overview*. Government of Bangladesh. https://www.ugc.gov.bd

Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) University Grants Commission of Bangladesh. (2009). *Higher education quality enhancement project (HEQEP): Project document*. University Grants Commission of Bangladesh. http://www.ugc.gov.bd

Institute of Quality Assurance Cell (IQAC) – SUST Shahjalal University of Science and Technology. (n.d.). *Institute of Quality Assurance Cell (IQAC)*. https://www.sust.edu

Kezar, A., & Sam, C. (2010). Understanding the new majority of non-tenure-track faculty in higher education: Demographics, experiences, and plans of action. *ASHE Higher Education Report, 36(4), 1-133.*

Lynch K (2014) Control by numbers: New managerialism and ranking in higher education. Critical Studies in Education. DOI: 10.1080/17508487.2014.949811.

Marginson, S. (2006). Dynamics of national and global competition in higher education. Higher Education, 52(1), 1-39.

Mignolo, W. D. (2012). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options**.** Duke University Press.

National Education Policy (NEP) 2011 Ministry of Education. (2011). National education policy 2011. Government of the People's Republic of Bangladesh. http://www.moedu.gov.bd

National Skills Development Policy (NSDP) 2011 Ministry of Education & Ministry of Labour and Employment. (2011). National skills

development policy 2011. Government of the People's Republic of Bangladesh. http://www.nsdc.gov.bd

Ong, A. (2006). Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty. Duke University Press.

Porter, T. M. (2012). Trust in numbers: The pursuit of objectivity in science and public life. Princeton University Press.

Power, M. (1999). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford University Press.

Shapin, S. (2008). Scientific life: Sociology of science in the field of science. Chicago University Press.

Slaughter, C., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. Johns Hopkins University Press.

Strathern, M. (2000). Audit cultures: Anthropological studies in accountability, ethics and the academy. Routledge.

University Grants Commission (UGC) Policies & Guidelines University Grants Commission of Bangladesh. (n.d.). *UGC guidelines and funding principles for higher education*. http://www.ugc.gov.bd

University Research Center (URC) – SUST Shahjalal University of Science and Technology. (n.d.). *University Research Center (URC): Objectives and functions*. https://www.sust.edu

World Bank Influence on Higher Education in Bangladesh World Bank. (2020). *Project appraisal document on a proposed credit to the People's Republic of Bangladesh for a higher education acceleration and transformation (HEAT) project*. World Bank. https://documents.worldbank.org

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৯
© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Safeguarding-Governmentality of the Cultural Heritage: Democratising, Conserving and Representing the Past(s) of Global South. *Md. Masood Imran*. Dhaka, Bangladesh: The University Press Limited, 2024

Muhammad Manowar Hossain[1]

Cultural heritage is a cultural property that remains deep-rooted in the lives of people living in a particular society or state. It is very necessary to fairly protect the property since it preserves the ethnical and archeological identity of the heritage-residents. People and land without heritages are like trees without roots and here lies the importance of protecting and preserving cultural heritage. *Safeguarding-Governmentality of the Cultural Heritage* by Md. Masood Imran aims to explore varied ideas related to some significant heritage sites including Paharpur, Bagerhat, Mahasthangarh of Bangladesh and Bhaktapur in Nepal and then analyses the preservation policy of these sites through the governmentalization of the authority concerned and the roles played by people who inherit the cultural legacy of those properties. The writer also examines and discusses the roles of transnational entities in preserving and managing these properties. At the same time the relation of popular beliefs, activities and cultural practices to the heritage points are illustrated through the presentation of this research work.

The book is composed of six chapters. Chapter 1 titled 'Problematisation' unfolds the dominant traits and tasks connected with the preservation programs of the aforementioned properties. Democratization of the past in museums in cooperation with the heritage-oriented people and that way a plan of action for preserving the sites can be considered here another concentration of discussion. The dominant management of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) along with ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) and ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation of Cultural Property) to protect the past glories has been elucidated. Problems concerning the interrelation among the state, its heritage-oriented people and transnational agencies have been indicated in this

[1] Muhammad Manowar Hossain, Associate Professor, Department of English, Govt Ashek Mahmud College, Jamalpur, Bangladesh. Can be reached at murad.mmh@gmail.com

chapter. The limitations with the existing ideas of and plans for the protection of past glories have been hinted by the writer. In short, to get a clear idea of the state power related to governing cultural and archaeological properties, of people surrounding it and of the dominating state together with other entities, the concept of 'safeguarding governmentality' has been applied as an analytical tool. Thus, with some introductory issues including some queries to the state, state-governed archaeological remains, heritage-oriented dwellers and supervising entities, this chapter initiates the overall discussion.

In chapter 2 'Transnational Safeguarding-Governmentality of the Cultural Heritage', the writer provides historical and theoretical background of some key concepts about the governing policy of the past cultural glories. The generation of ideas by transnational agencies concerning archaeological properties has been critically analyzed in this chapter. It states how the archaeological records have been connected with the traditional, cultural and religious beliefs of local people and how their ideas, beliefs and suspicions work towards the activities of foreign excavators. Some religious concepts revolving around the archaeological sites have been mentioned, when relevant. It is discussed how the wrong categorization process decided by the agencies has ignored the appropriate preservation of those sites. At the same time, the lack of knowledge and awareness of local residents as well as other stakeholders (of these properties) can be traced here. However, the opposite facts are also evident. In Bhaktapur, Nepal, as stated by the writer, a clash appeared between transnational agencies and local authorities on the issue of preserving the style of their glories where local authority demonstrated their spirit of identity and patriotism. It happened because of misunderstandings between the two parties in deciding the exact way of preservation.

Chapter 3 titled 'Managerial Safeguarding-Governmentality of Cultural Heritage' presents the managerial policy of the state and transnational bodies, that systematically govern the heritage sites. This chapter deals with some keywords such as 'heritage', 'tradition', 'values', 'custom', and 'culture' along with the Bangla expressions 'oiytijjho', 'uttaradhikar', 'protha' and so on, and later explains how the traditionally-applied meanings of these words have been turned into new meanings and ideas – keeping pace with the safeguarding policy of the rationalized managerial governance. In this regard, the influence of heritage diplomacy orchestrated by the transnational agencies has been exposed to the readers. The presentation of a new way of understanding 'tradition' and 'heritage' following Ronstrom (2005) is mentionable, although the popular idea (of heritage- residents) of the 'past', 'history' or 'tradition'

cannot match that of the dominating entities. This part clarifies how the authority acquires the land of natives, to safeguard archaeological sites, and discusses some limitations of these rules they impose on the residents. The writer sometimes relates the clash of interest between the institutional authority and local people, on the basis of misunderstanding of the way of acquiring the heritage sites. It has been exposed through some interviews with local people. The researcher addresses some measures taken by the authorities to reduce the gap of understanding and to mitigate the sad consequences.

In chapter 4 'Accommodating Heterogeneous Voices of the Past(s) of Democratising the History', the researcher investigates some oral as well as written stories (or 'history', in the sense of heritage residents) such as stories of the Hindu king Parshurama and Muslim saint Shah Sultan Mahisawar, of Behula-Lakhindar and some others, and tries to search connections of those narratives with their religious views, established cultural beliefs and with the archaeological realities. The instances of Khan Jahan Ali's Dighi, Khodar Phathar Bhita, crocodiles, tranporter stone slab etc. appear and are critically analyzed by the researcher. The writer feels it is necessary to protect cultural glories with the process of democratization of the past in true historical records. He reveals that the established records of the history are not opposed to the local dwellers' oral history – there is a somewhat consistency between the two, though the imagined fiction and investigated fact are sometimes jumbled here. According to the writer's observation, the local residents' understanding of the previous events was termed 'history' by them, though at the same time, archaeological evidence-based history is supported by them, as stated in Tabibur Rahman's book 'The Homicide of Parasurama'. This book has been considered a nice instance of democratic history. However, the existing governing theories could not in every way entertain the popular ideas. There is a tendency to decide ownership of the past in favour of established forces, ignoring common people. To do this, the acknowledged state identity, written history and archaeology are sometimes used as important tools. The writer of this book, however, intends to decline any homogeneous ownership and arrange arguments to provide facts of the functional participation of heterogenous entities in true history. He emphasizes on the need to engage popular perceptions in mainstream history. He believes that it can functionally protect the archaeological glories.

Chapter 5 titled 'The Democratisation of Representing the Past(s) in Museum as the Design of Action for Safeguarding the Cultural Heritage' is concerned with the previous emphasis on the safeguarding policy of heritage points with

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

certain problems and prospects, especially the complications related to governmentalization and management of local residents. As the writer puts importance on appreciating the heritage-dwellers' perceptions of the relevant past and on finding a mechanism that can ensure their participation in safeguarding the archaeological glories, he tries selecting appropriate samples and data management procedures, favourable to this sort of effort. The museums of the sites, in accordance with his judgement, have been deemed appropriate venues to provide mechanisms for the expected kind of authority-public participation. Generally, public participation is not appreciated and feeling ignored, they consider themselves alienated and eventually keep themselves aloof from any positive concern. The writer engages heritage-oriented people in his interview schedule, lets them express their understanding of the target area and receives very positive responses that can be considered helpful to protecting the heritage sites because these people feel honoured while getting the chance to show their ideas and opinions. This way they feel that they too belong and then realize that the archaeological site is theirs; it is their duty to safeguard it.

The writer opines that it is essential for this research study to be digitalized and equipped with 3D-generated models, for the sake of better understanding and better protection. This is a very nice and effective idea that popular stories, beliefs, and practices can be recorded and preserved under the title of "People's History", according to the writer's proposition. In line with this proposition, the writer thinks of a better type of safeguarding strategy by recording events, mapping heritage areas, modelling the present and generating 3D models of the documents. Thus, he advocates the study and conservation of archaeology and its history digitally.

Chapter 6, the last chapter named 'Conclusion' includes the writer's conclusive statements, refers to the writers and the works helpful to this research, provides enclosures that present the heritage records he surveyed and an index mentioning relevant points, names and topics. It depicts the wide breadth of the writer's sources and the vast area of research.

To conclude, *Safeguarding-Governmentality of the Cultural Heritage* by Md. Masood Imran provides readers and researchers with a comprehensive study of some important archaeological glories of Bangladesh and Nepal with their problems and prospects revolving around the preservation and development efforts. The writer, after clarifying the issues of governmentality, culture, archaeology, heritage and some other key ideas, endeavours to address the

© ২০২৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

existing constraints with some historical and archaeological glories in Bangladesh and Nepal. With his extensive study, field observation and interviews, the writer tries to get a clear understanding of the nature of those constraints and the way of possible solutions, to protect the heritage sites. The writer is clearly and fairly in favour of common people, their interests and rights of participation in the entire process. This favour is not an emotional one, it is based on some practical considerations. It is clearly explained in the book that when common people are allowed to use their voices and express their ideas, beliefs and perceptions, they find an attachment to those archaeological sites and eventually feel the necessity of preserving their past values. He places much stress on democratizing the past by ensuring fair participation of all the stakeholders, for the overall protection of the archaeological identities. And to confirm this protection in a better way, he proposes digitalization and 3D modelling of all records. His studies and investigations concentrate on one issue: an effective safeguarding policy for archaeological sites. His findings and propositions which aim to ensure the exact protection and preservation of the archaeological assets significantly deserve special attention. And therefore, this book seems relevant and important for readers, students, researchers and others concerned about archaeology.

ISSN: 1680-0621

Nrvijnana

Patrika

Volume 29 **2024**

Department of Anthropology ● Jahangirnagar University ● Dhaka